যুবসমাজ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং পরিবেশ

রচনা ও সংকলন

মোঃ ইফতেখার আলী

সৈয়দ নাভিদ আনজুম হাসান

রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস্ বাংলাদেশ (রিইব)

যুবসমাজ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং পরিবেশ
Youth, ICT and Environment

রচনা ও সংকলন: মোঃ ইফতেখার আলী সৈয়দ নাভিদ আনজুম হাসান	Written & compiled by: Md. Iftekhar Ali Syed Navid Anjum Hasan
প্রকাশকাল: ২০২৩	Published in: 2023
প্রকাশনায়: রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস্, বাংলাদেশ (রিইব) বাসা ০৭ (কাজলী), সড়ক ১৭, ব্লক সি বনানী, ঢাকা-১২১৩, বাংলাদেশ ফোন ঃ (+৮৮০-২) ২২২২৭৪০৫১	Published by: Research Initiatives, Bangladesh House 07, Road 17, Block C, Banani, Dhaka-1213, Bangladesh Phone: (+880-2) 222274051

ই-মেইল ঃ rib@citech-bd.com; ওয়েবসাইট ঃ www.rib-bangladesh.org

সহায়তায়: রোসা লাক্সেমবার্গ স্টিফ্টুং স্ট্রেসে দের প্যারিসের কমিউন ৮এ ১০২৪৩, বার্লিন, জার্মানী	Supported by: Rosa Luxemburg Stiftung Straße der Pariser Kommune 8A 10243 Berlin, Germany
মুদ্রণে: ডানা প্রিন্টার্স লিমিটেড গ-১৬, মহাখালী বা/এ বনানী, ঢাকা-১২১৩	Printed by: Dana Printer Limited Ga-16, Mohakhali C/A Banani, Dhaka-1213

Sponsored by the Rosa Luxemburg Stiftung with funds of the Federal Ministry for Economic Cooperation and Development of the Federal Republic ofGermany. The publication or parts of it can be used by others for free as long as they provide a proper reference to the original publication. The content of the publication is the sole responsibility of the author of the RIB and does not necessarily reflect the position of RLS.

মুখবন্ধ

রিইব-এর কাজের অন্যতম উদ্দেশ্য প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন ও তাদের সৃজনশীল উদ্যোগের বিকাশ। এক্ষেত্রে সামাজিক ও পরিবেশগত ন্যায্যতার প্রশ্ন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে দেশের জনসংখ্যার তিন ভাগের একভাগ যুবসমাজ। সাম্প্রতিক সময়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং সামাজিক মূল্যবোধের পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে প্রান্তিক যুবরা নতুন ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছেন। রিইব-এর কর্মকর্তা মোঃ ইফতেখার আলী ও সৈয়দ নাভিদ আনজুম হাসান তাদের মাঠপর্যায়ের কাজের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে এসব পরিবর্তন ও চ্যালেঞ্জ কাছ থেকে প্রত্যক্ষ করেছেন। এসব বিষয়ের সাথে আবার আন্তর্জাতিক অর্থনীতি ও রাজনীতি গভীরভাবে জড়িত। তাই তারা মাঠ পর্যায়ের অভিজ্ঞতা, রিইব-এর বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী বিশেষজ্ঞবৃন্দের মতামত এবং গণমাধ্যম ও বইপুস্তকে প্রকাশিত বক্তব্যের সমন্বয়ের মাধ্যমে এই বইতে যুবসমাজের অবস্থান ও ভূমিকা বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছেন।

সভ্যতার অংশীদারিত্ব থেকে বঞ্চিত হওয়া দারিদ্র্যতার অন্যতম কারণ হিসেবে বিবেচিত হয়। অন্যদিকে সকল নাগরিকের সমান অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা প্রদান বাংলাদেশের সংবিধানের অন্যতম মূলনীতি। কিন্তু দেখা গেছে সম্পদের অসম বন্টন এবং সামাজিক ও পরিবেশগত ন্যায্যতার ঘাটতির কারণে জনসংখ্যার বিশাল একটা অংশ নানা ধরনের বঞ্চনার শিকার হচ্ছে। অন্যদিকে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিঘাত আরও ভয়াল রূপ ধারণ করছে। এক্ষেত্রে যুবসমাজের ভূমিকা কী হবে তা পৃথিবীর অস্তিত্বের প্রশ্নের সাথে জড়িত।

আমাদের পৃথিবীর সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ যেন সকলের শান্তি ও সমৃদ্ধি নিশ্চিত করতে পারে- সেই লক্ষ্যে রিইব-এর ক্ষুদ্র প্রয়াস এই প্রকাশনা। আশা করি বিষয়বস্তুর সাথে সংশ্লিষ্ট সবাই প্রকাশনাটির মাধ্যমে বর্তমান জীবনযাপন পদ্ধতি ও অর্থনৈতিক-সামাজিক ব্যবস্থার সংকট ও সম্ভাবনা উপলব্ধি করতে পারবেন এবং করণীয় নির্ধারণে সংবেদনশীল হবেন।

শামসুল বারি
চেয়ারপার্সন, রিইব

সূচিপত্র

ভূমিকা
যুবসমাজ ও মানুষের সমাজ
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং জেন্ডার
পরিবেশ
উপসংহার



ছবি ঃ বর্তমানে যোগাযোগ ও অর্থনৈতিক কার্যক্রম অনেকটাই তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নির্ভর

ভূমিকা

যুবসমাজের অবস্থান মানুষের সমাজের বাইরে নয়। ফলে যুবসমাজ বিষয়ক আলাপে সার্বিক সামাজিক কাঠামো যেমন প্রাসঙ্গিক, তেমনি ভৌগলিক ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যও এই আলাপকে প্রভাবিত করে। দেশের সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, রাষ্ট্রীয় নীতি, আন্তর্জাতিক সংশ্লিষ্টতা এবং নাগরিকদের মূল্যবোধ ও প্রথার মাধ্যমে জীবন যাপনের যে রূপরেখা তৈরি হয়, যুবসমাজসহ সমাজের সকলকেই তার সাথে তাল মিলাতে হয়। মানুষের যাপনের এই রূপরেখা তৈরিতে ঐতিহাসিকভাবে নানা বিষয় প্রভাব রেখেছে। প্রাকৃতিক সম্পদ, গোষ্ঠী, সংস্কৃতি, ধর্ম, রাজনীতি, অর্থনীতি, প্রযুক্তি প্রভৃতির ভিত্তিতে ইতিহাসের নানা পর্যায়ে মানুষের আচরণ ও যাপন বদলেছে। নানা বদল ও বাঁক পেরিয়ে আধুনিক মানুষ ভৌগলিক পরিসরে রাষ্ট্রের মানচিত্রে বাঁধা পড়েছে। আবার তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের মধ্যে তাৎক্ষনিক যোগাযোগের সুযোগও সৃষ্টি হয়েছে। এর পাশাপাশি এসব যোগাযোগ ও লেনদেন বিষয়ক তথ্যের সুবিশাল ভান্ডার গড়ে উঠেছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভাবনীয় প্রসারের ফলে যুবসমাজের সামনে যে দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে তার বিশ্লেষণ জরুরী। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রসারকে সাধারণত মানব সমাজের অমোঘ নিয়তি হিসাবে দেখা হয় এবং সাধুবাদ জানানো হয়। এর অন্তর্নিহিত বিষয়গুলো তেমন আলোচনায় আসে না।

জাতীয় যুবনীতি ২০১৭-তে বাংলাদেশের যুবসমাজের ১৬টি শ্রেণির কল্যাণে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলা হয়েছে। শ্রেণিগুলো হচ্ছে বেকার যুব, যুবনারী, যুব উদ্যোক্তা, অভিবাসী যুব, গ্রামীণ যুব, শিক্ষা থেকে ঝরে পড়া যুব, নিরক্ষর ও স্বল্পশিক্ষিত যুব, অদক্ষ যুব, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী যুব, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন যুব, অসুস্থ জীবনে আসক্ত যুব, গৃহহীন ও বস্তিবাসী যুব, হিজড়া যুব, দুর্যোগ অথবা দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত যুব, মানবপাচার ও নির্যাতনের শিকার যুব এবং সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত যুব। এসব যুবদের প্রান্তিক জনগোষ্ঠী বলা যায় এবং তারা নানা ধরনের মৌলিক অধিকার ও সুযোগ থেকে বঞ্চিত। যুবনীতিতে যুব জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে যুবদের ক্ষমতায়ন, স্বাস্থ্য, বিনোদন, সুশাসন, টেকসই ও সুষম উন্নয়ন, সুস্থ সমাজ বিনির্মান,

বিশ্বায়ন এবং জরিপ ও গবেষণায় অগ্রাধিকার দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। তবে স্বল্পমেয়াদী বা দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পিত কার্যক্রম, বাজেট বরাদ্দ এবং কর্তৃপক্ষের মধ্যে সমন্বয়ের ঘাটতির ফলে এসব বিষয়ে সামান্যই অগ্রগতি হয়েছে। এছাড়া স্থানীয় উদ্যোগের প্রসারের পরিবর্তে কেন্দ্রীভূত বা উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া কার্যক্রম প্রান্তিক যুবদের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ।[১] এসবের সাথে তাল মিলানোর মত সম্পদ বা যোগাযোগ তাদের অনেকেরই থাকে না। এরকম সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার পেছনে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট প্রভাব রেখেছে। ফলে করণীয় নির্ধারণে এই প্রেক্ষাপটের বিশ্লেষণ প্রয়োজন। তাই চলতি আলাপে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ও পরিবেশের সাথে যুবসমাজের সম্পর্ক ও মিথস্ক্রিয়া তুলে ধরা হয়েছে।

যুবসমাজ ও মানুষের সমাজ

সরকারিভাবে ১৮-৩৫ বছর বয়সী জনগোষ্ঠীকে যুব হিসাবে অভিহিত করা হয়।[২] বাংলাদেশের জনসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ যুব। বিগত ২০০৮ সালের নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর দেশের ভোটার তালিকায় প্রায় সাড়ে তিন কোটি যুব যুক্ত হয়েছে। তবে ২০২৩ সাল পর্যন্ত দেশের রজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে জাতীয় নির্বাচন আয়োজনের প্রক্রিয়া নিয়ে মিমাংসা হয়নি। ফলে সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক গণতান্ত্রিক পরিবেশে ভোট দেওয়ার অধিকার থেকে নতুন যুব ভোটাররা বঞ্চিত হয়েছে। এর পাশাপাশি প্রতিবেশী দেশ মায়ানমার থেকে প্রাণ বাঁচাতে পালিয়ে আসা প্রায় ১০ লাখ রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী বাংলাদেশে অবস্থান করছেন, যাদের একটা অংশ যুব। যুবসমাজকে প্রাণশক্তির প্রতীক মনে করা হয়। কিন্তু ২০২৩ সালে *সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)* পরিচালিত এক যুব জরিপে দেখা গেছে ৪৩ ভাগ যুব নিজস্ব মতামত প্রকাশে অস্বস্তিতে থাকেন এবং ৩৬ ভাগ যুব অতীতে মতামত প্রকাশ করতে যেয়ে হেনস্তা বা হয়রানির শিকার হয়েছেন। যুবদের মধ্যে রাজনীতিতে আগ্রহীদের হার মাত্র ১১.৬ ভাগ, এর বিপরীতে রাজনীতিতে অনাগ্রহীদের হার ৩৫ ভাগ। এছাড়া ৬৯.৪ ভাগ যুব উন্নয়নের বাধা হিসাবে দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতিকে চিহ্নিত করেছেন। এজন্য উন্নয়নের অগ্রাধিকার হিসাবে ৫৬.২ ভাগ যুব দুর্নীতি দমন, জবাবদিহিতা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতার কথা বলেছেন এবং অর্ধেকের বেশি যুব মানসম্মত শিক্ষা ও দক্ষতা বৃদ্ধির প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন।[৩]

বাংলাদেশ মূলত কৃষিজীবী, গার্মেন্টস শ্রমিক ও প্রবাসী শ্রমিক চালিত অর্থনীতির দেশ। *ত্রৈমাসিক শ্রমশক্তি জরিপ* ২০২৩ (জুলাই-সেপ্টেম্বর) অনুযায়ী[৪], দেশের ১৭ কোটি ১৮ লাখ মানুষের মধ্যে ১৫ ও তদুর্দ্ধ বয়সী কর্মক্ষম মানুষের সংখ্যা ১২ কোটি ১০ লাখ। কর্মক্ষম জনসংখ্যার ৬১ ভাগ বা ৭ কোটি ৩৪ লাখ মানুষ শ্রমশক্তির অন্তর্ভূক্ত। কর্মক্ষম পুরুষদের ৮০ ভাগ শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণ করলেও নারীদের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণের হার ৪২ ভাগ। এছাড়া শ্রমশক্তির প্রায় ৯৭ ভাগ কর্মে নিয়োজিত আছেন, যার মধ্যে প্রায় ২ কোটি ৪৬ লাখ নারী এবং ৪ কোটি ৬৪ লাখ পুরুষ অন্তর্ভূক্ত। দেশে বেকারত্বের হার ৩.৩১ ভাগ। সংখ্যাগত দিক থেকে ১৬ লাখ পুরুষ এবং

৮.৩০ লাখ নারী বেকার আছেন। অর্থাৎ বেকার জনগোষ্ঠীর ৩৪ ভাগ নারী এবং ৬৬ ভাগ পুরুষ। তবে যুবদের ১০.৬ শতাংশ বেকার, যা জাতীয় বেকারত্বের হারের চেয়ে ২.৫ গুণ বেশি। উচ্চশিক্ষিত যুবদের বেকারত্বের সবচেয়ে বেশি। বিশ্ববিদ্যালয় পাশ করা যুবদের ১৩.৪ শতাংশ বেকার। সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের মতে, শিক্ষিত যুবদের মধ্যে ভাষাগত ও আচরণগত দক্ষতার যথেষ্ট ঘাটতি আছে এবং চাকরির বাজারে তাদের দক্ষতার যোগান ও চাহিদার সমন্বয় হচ্ছে না। বৈশ্বিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিসরে কী ধরনের শ্রমবাজার তৈরি করেছে, সেখানে অংশগ্রহণ করতে হলে কী ধরনের দক্ষতা প্রয়োজন এবং সেই বিশেষ দক্ষতা কোথা থেকে অর্জন করা যাবে সেই বিষয়ে যুবদের তথ্যের ঘাটতি আছে। কোভিড-১৯ মহামারীর পর শ্রমবাজারে কাজের ধরনে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। কিন্তু অধিকাংশ যুবদের মধ্যে নিজস্ব উন্নয়নে সময় ও শ্রম বিনিয়োগের অভাব এবং সহপাঠ্যক্রমে অংশগ্রহণের অনীহা রয়েছে। অন্যদিকে কৃষি ও কারিগরি শিল্পে জড়িত তরুণ ও যুবদের সামাজিক অবমূল্যায়ণের মুখোমুখি হতে হয়।[৫]

বর্তমান শ্রমশক্তিতে ১৫-২৯ বছর বয়সী ১ কোটি ২৯ লাখ যুব নারী এবং ১ কোটি ৩২ লাখ যুব পুরুষ আছেন, যা মোট শ্রমশক্তির ৩৬ ভাগ। পুরুষ শ্রমশক্তির ২৮ ভাগ এবং নারী শ্রমশক্তির ৫১ ভাগের বয়স ১৫-২৯ বছর। এছাড়া দেশের শ্রমশক্তির ৪৪ ভাগ কৃষি, ৩৯ ভাগ সেবা এবং ১৭ ভাগ শিল্প খাতে নিয়োজিত।

ভারতীয় উপমহাদেশে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বনির্ভর গ্রামব্যবস্থার ভাঙন এবং শিল্পায়ন, নগরায়ন ও বাণিজ্যিক অর্থনীতির প্রসারের ফলে জীবন-জীবিকার জন্য বর্তমানে চাকরী বা জব ব্যাপক কাঙ্খিত হয়ে উঠেছে। কিন্তু ব্যাপক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়ন সত্ত্বেও এই দেশের কর্মসংস্থান মূলত অনানুষ্ঠিক খাত নির্ভর। *শ্রমশক্তি জরিপ* ২০১৬-১৭ অনুযায়ী শহরের শ্রমশক্তির ৭৭ ভাগের বেশি অনানুষ্ঠানিক খাতে কর্মরত, যার সংখ্যা প্রায় ১ কোটি ৩০ লক্ষ। শহর-গ্রাম মিলিয়ে দেশে কর্মরত ৬ কোটি ৮ লক্ষ শ্রমশক্তির ৮৫ ভাগই (৫ কোটি ১৭ লক্ষ) অনানুষ্ঠানিক খাতে যুক্ত ছিল। এর বিপরীতে ১৭ কোটি জনসংখ্যার দেশে আনুষ্ঠানিক খাতে নিযুক্ত ছিল মাত্র ৩৮ লক্ষ মানুষ। সরকারি চাকরি তাই এখন সোনার হরিণ। গ্রামাঞ্চলে প্রকাশ্যে শিশু-

কিশোরদের সামনে সরকারি চাকরি পেতে কী পরিমান ঘুষ দিতে হবে এবং চাকরিতে যোগ দেওয়ার পর কী কী বাড়তি সুবিধা পাওয়া যাবে তা নিয়ে আলাপ চলে। এছাড়া সামরিক বাহিনীর চাকরীও পছন্দের শীর্ষে। এসব চাকরির নিশ্চিত বেতন, পেনশন এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা এগুলোকে যুবসমাজের কাছে কাঙ্খিত করে তুলেছে। উচ্চপদস্থ সামরিক-বেসামরিক আমলাদের স্থায়ী আবাসন নিশ্চিত করার জন্য সমৃদ্ধ গ্রাম ও উর্বর কৃষিজমিকে মডেল টাউনে রূপান্তরিত করা হয়।[৬] ফলে খাদ্য ও কৃষি উৎপাদন হ্রাস পেলেও জমির দাম বাড়ে।[৭] জমি বরাদ্দ পাওয়ার কয়েক বছর পর সেসব জমি ক্রয়মূল্যের কয়েক গুণ দামে বিক্রি করে ধনী ও ক্ষমতাবানরা বিদেশে পাড়ি জমান। প্রশাসনিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে ক্ষমতাবান ও বিত্তশালী শ্রেণির মানুষ সাধারণত চিকিৎসার জন্য এদেশের পাবলিক হাসপাতালে যান না, তাদের সন্তানরাও এদেশের শিক্ষাক্রমে পড়ে না। তাদের লক্ষ্য থাকে যত দ্রুত সম্ভব পরিবার-পরিজন নিয়ে বিদেশে উড়াল দেওয়া। কিন্তু এজন্য প্রয়োজনীয় অর্থ যোগাড়ের জন্য নানা ধরনের দুর্নীতি ও অনিয়মের আশ্রয় নিতে হয়, যা উপরে উল্লেখিত *সিপিডি*-র যুব জরিপের ফলাফলেও প্রতিফলিত হয়েছে। বিগত ১৫ বছরে (২০০৮-২০২৩) ক্ষমতাসীনরা অনিয়মের মাধ্যমে ব্যাংক থেকে প্রায় ৯২ হাজার কোটি টাকা লুট করেছেন।[৮] সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মাধ্যমে বছরে প্রায় ৮০ হাজার কোটি টাকা দেশ থেকে পাচার হচ্ছে।[৯] সার্বিকভাবে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর বিগত ৫০ বছরে *বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি*-র হিসাবে প্রায় ৮ লাখ কোটি টাকা বিদেশে পাচার হয়েছে।[১০]

তবে দেশের অধিকাংশ মানুষের জীবনের পথ এরকম নয়। তাদেরকে বেঁচে থাকার জন্য নানা অনানুষ্ঠানিক খাতে শ্রম বিক্রি করতে হয়। *আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা* (*আইএলও*) এর মতে অনানুষ্ঠানিক কাজ হচ্ছে: দোকানভিত্তিক ক্ষুদ্র ব্যবসা, রাস্তায় নানা ধরনের জিনিস বিক্রি, দর্জি ও সেলাই, জুতা সেলাই ও কালি, বিভিন্ন ধরনের ওয়ার্কশপ, যানবাহনের চালক-কন্ডাকটর-হেলপার, নির্মাণ শ্রমিক, রাজমিস্ত্রি ও হেলপার, জোগালি, গৃহকর্মী, টোকাই, বর্জ্য সংগ্রাহক ইত্যাদি। সাম্প্রতিক সময়ে হকার, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, পরিবহন শ্রমিক, নির্মাণ শ্রমিক, হোটেল-রেস্টুরেন্ট শ্রমিক এবং মোটর ওয়ার্কশপে কর্মরত শ্রমজীবীর সংখ্যা বেড়ে চলেছে। সারা দেশে মাটি-বাঁশ-পাতা-কাঠ

নির্ভর ঘরবাড়ি ইট-কংক্রিটের ভবনে রূপান্তরণ এবং নতুন নতুন অবকাঠামো নির্মাণের ফলে কংক্রিট-লোহা-কাঁচ-প্লাস্টিক ভিত্তিক নির্মাণ শ্রমিক ও কারখানা শ্রমিকের সংখ্যা ব্যাপক বৃদ্ধি পেয়েছে। তৈরি পোশাক শিল্পের প্রায় ৭০ ভাগ শ্রমিকের নিয়োগের ধরন এবং কাজের পরিবেশও অনানুষ্ঠানিক ধরনের। এর পাশাপাশি মারাত্মক স্বাস্থ্যঝুঁকির বিড়ি উৎপাদন ও জাহাজ ভাঙা শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকরা রয়েছেন। আর আধুনিক অনানুষ্ঠিক খাত বা প্রিক্যারিয়াট (নিরাপত্তাহীন শ্রেণি) এর মধ্যে রয়েছে ডেলিভারি সার্ভিস কর্মী, ট্রাভেল ব্লগার, ফুড ব্লগার, ফ্রিল্যান্সার, অনলাইন ব্যবসায়ী ইত্যাদি। এসব আধুনিক কাজের আকর্ষণীয় নাম এসব জীবিকার নিরাপত্তাহীনতা ও অন্যান্য ঝুঁকিকে আড়ালে রাখে। এসব কাজে নিয়োগকর্তার সাথে সরাসরি যোগাযোগের সুযোগ কম থাকে। সার্বিকভাবে অনানুষ্ঠানিক খাতের কর্মসংস্থানের বিশালতা, নতুন চাকরির স্বল্পতা, নিরাপত্তাহীনতা এবং অস্থায়িত্ব বর্তমান জীবন-জীবিকার মূল বাস্তবতা। অনানুষ্ঠানিক খাতের অধিকাংশ শ্রমিক যে আয় করেন তাতে কোন মতে বেঁচে থাকা গেলেও, মৌলিক চাহিদা পূরণ বা দারিদ্র বিমোচনে তা যথেষ্ট হয় না। খুব অল্প সংখ্যক ছোট উদ্যোক্তা তাদের ব্যবসা বা সেবা প্রদানের পরিসর বড় ও লাভজনক করতে পারেন। এছাড়া অনানুষ্ঠানিক খাত বিদ্যমান থাকায় আনুষ্ঠানিক খাতের শ্রম মজুরি কম হয়। অনানুষ্ঠানিক খাতের বদৌলতে আনুষ্ঠানিক খাতের শ্রমজীবীদের জীবন ব্যয় কিছুটা কম হওয়ায় মালিকপক্ষ নিযুক্ত শ্রমিকদের কম বেতন দেন। ফলে দেশের অধিকাংশ মানুষের জীবন ধারনের জন্য প্রয়োজনীয় আয়ের নিশ্চয়তা, সামাজিক নিরাপত্তা ও কাজ হারালে কোন সুরক্ষার ব্যবস্থা থাকে না। এর পাশাপাশি শ্রমজীবী মানুষের নিজস্ব সংগঠনের অপ্রতুলতা তাদের সুরক্ষা ও দেনদরবারের ক্ষেত্রে একটি বড় চ্যালেঞ্জ। পেটের দায়ে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বেকার থাকার সুযোগ থাকে না। এজন্য কাজ না থাকলে তাদের কাজ সৃষ্টি করতে হয়। ফলে তাদেরকে কুলি, টোকাই, হকার বা রিকশা চালানোর মত কষ্টদায়ক ও অনিশ্চিত পেশা বেছে নিতে হয়। পারিবারিক দারিদ্রতার জন্য শিশু-কিশোরদের যুক্ত হতে হয় মোটর ওয়ার্কশপ, রেস্টুরেন্ট, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বা জাহাজ ভাঙার মত বিপজ্জনক ও ঝুঁকিপূর্ণ শিল্পে। অথচ ২০২৩ সালের শ্রমশক্তি জরিপে অনানুষ্ঠানিক খাতের শ্রমশক্তির কোন উল্লেখই নেই।[১১]

২০২২-২৩ অর্থবছরে বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় হিসাব করা হয়েছে ২,৭৬৫ মার্কিন ডলার বা ২,৭০,৪১৪ টাকা।[১২] অর্থাৎ শিশু থেকে বৃদ্ধ দেশের প্রতিটি মানুষের মাসিক আয় অন্তত ২২,৫৩৪ টাকা হওয়ার কথা। এর বিপরীতে বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত শ্রমিক/ কর্মচারীর জন্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত নিম্নতম মজুরি নিচে দেওয়া হল[১৩]:

শিল্প	মাসিক নিম্নতম মজুরি (টাকা)	শিল্প	মাসিক নিম্নতম মজুরি (টাকা)
ব্যক্তিমালিকানাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠানের অদক্ষ প্রাপ্তবয়স্ক ও কিশোর শ্রমিক	২৫০০	রাইস মিল	৭৮১০
সিনেমা হল	২৬১০	ব্যক্তিগত পাটকল	৮০০০
হোটেল ও রেস্টুরেন্ট	৩৭১০	ব্যক্তিমালিকানাধীন সড়ক পরিবহন	৮০০০
তেল মিল ও সবজি	৪২০০	প্লাস্টিক	৮০০০
ম্যাচ কারখানা	৪৫৬০	ফার্মাসিউটিক্যাল	৮০৫০
জুট প্রেস এন্ড বেলিং	৪৮৫০	প্রিন্টিং প্রেস	৮১৫০
দর্জি কারখানা	৪৮৫০	গ্লাস	৮৫০০
সাবান ও কসমেটিকস	৫৬৪০	চা বাগান	৮৫৫০
কটন টেক্সটাইল	৫৭১০	সিকিউরিটি সার্ভিস	৯১৪০
অটোমোবাইল ওয়ার্কশপ	৫৯৩০	মাছ ধরার ট্রলার	১০৫২০
বেকারী ও কনফেকশনারী	৫৯৪০	গার্মেন্টস	১২৫০০
কোল্ড স্টোরেজ	৬০৫০	হোসিয়ারি	১২৮০০
চিংড়ি	৬৭০০	ট্যানারী	১২৮০০
বিড়ি	৬৭৫০	রাবার শিল্প	১২৯১০
চা প্যাকেটিং	৭০৮০	জাহাজ ভাংগা	১৫০০০
চামড়াজাত ও জুতা	৭১০০	নির্মাণ ও কাঠ	১৬২৪০

বাংলাদেশে গার্মেন্টস বা তৈরি পোশাক শিল্প থেকে রপ্তানি আয়ের ৮৪ ভাগ অর্জিত হয়। প্রায় ৪৬ বিলিয়ন ডলার অর্থনীতির গার্মেন্টস খাতে প্রায় ৩২ লাখ শ্রমিক কাজ করছেন, যার ৫৮ ভাগ নারী। টাকার বিপরীতে ডলারের মান কমে যাওয়ায় গার্মেন্টস মালিকরা ২০২৩ সালে প্রায় ৯০ হাজার কোটি টাকা বাড়তি পেয়েছেন। কিন্তু যেসব গার্মেন্টস শ্রমিকদের অক্লান্ত শ্রমে এই খাত চলছে তাদের নিম্নতম মজুরি ২০২৩ সালের নভেম্বরে নির্ধারণ করা হয়েছে ১২,৫০০ টাকা। অথচ ২০১৮ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে চালের দাম ১৫%, ডাল ১২০%, আটা ৮৮%, আলু ৮০%, খোলা সয়াবিন ৯৫%, লবণ ৬৮%, ডিম ৬৭%, দুধ ১০০%, চিনি ১৮০%, ব্রয়লার মুরগি ৪৮% এবং মাছের দাম ১০০% বৃদ্ধি পেয়েছে। চার সদস্যের পরিবারের দারিদ্রসীমা অতিক্রমের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য খরচ যোগাতে মাসে অন্তত ২৩ হাজার টাকা প্রয়োজন হয়। এছাড়া শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের বাণিজ্যিকীকরণের প্রেক্ষিতে অন্যান্য বাড়তি খরচতো আছেই। ফলে অপুষ্টি, হতাশা, ঋণ, সহিংসতা এখন নিত্যসঙ্গী। এজন্য গার্মেন্টস শ্রমিক সংগঠনগুলো মজুরি বৃদ্ধির আন্দোলন অব্যাহত রেখেছেন। ২০২৩ সালে মজুরি বৃদ্ধির আন্দোলনের সময় গার্মেন্টস মালিকপক্ষ প্রায় ৩০০ রপ্তানিমূখী পোশাক কারখানা সাময়িক বন্ধ রেখেছিলেন।[১৪] নিচে বিভিন্ন সময় শ্রমিক সংগঠনগুলোর দাবিকৃত এবং সরকার নির্ধারিত নিম্নতম মজুরির তুলনামূলক চিত্র দেওয়া হল[১৫]:

বছর	১৯৯৪	২০০৬	২০১০	২০১৩	২০১৮	২০২৩
দাবিকৃত মজুরি		৩০০০	৫০০০	১২০০০	১৬০০০	২৫০০০
নির্ধারিত নিম্নতম মজুরি	৯৩০	১৬৬২	৩০০০	৫৩০০	৮০০০	১২৫০০

দেশে শ্রমের মজুরি কম হওয়ায় হয়তো সম্প্রতি রেকর্ডসংখ্যক অভিবাসী শ্রমিক কাজ করতে বিদেশে পাড়ি দিয়েছেন। কভিড-১৯ মহামারীর কারণে ২০২০ সালে অভিবাসন থমকে গেলেও, পরবর্তীতে ২০২১ সালে ৬ লাখ ১৭ হাজার, ২০২২ সালে ১১ লাখ ৩৫ হাজার এবং ২০২৩ সালে ১৩ লাখ কর্মী কাজের জন্য বিদেশে গেছেন।[১৬] প্রবাসী শ্রমিকরা বছরে প্রায় ২০ বিলিয়ন ডলার রেমিট্যান্স পাঠান। তবে এসব শ্রমিকের অধিকাংশই অদক্ষ। ২০২২ সালে বিদেশে যাওয়া শ্রমিকদের মাত্র ২৫ ভাগ দক্ষ শ্রমিক ছিলেন।

সার্বিকভাবে মন্ত্রীদের হিসাবে বিশ্বের ১৭৬টি দেশে প্রায় ১.৫ কোটি প্রবাসী শ্রমিক কর্মরত আছেন। আর বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাবে তা ১.২৫ কোটি এবং *বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো*র মতে এই সংখ্যা ৫০ লাখ।[১৭] অন্যদিকে ২০২৩ সালে *ওয়েজ অর্নার্স কল্যাণ বোর্ড* এর হিসাবে প্রায় ৮১ হাজার প্রবাসী খালি হাতে দেশে ফিরে এসেছেন।[১৮]

সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের অর্থনীতির আকার অনেক বেড়েছে। কিন্তু দেশের মোট আয়ের ৪১ ভাগ চলে যায় মাত্র ১০ ভাগ পরিবারের কাছে। আর নিচের দিকের ৫০ ভাগ পরিবার মোট আয়ের মাত্র ১৯ ভাগ পায়। দেশে অসমতা পরিমাপক গিনি সহগের মাত্রা হয়েছে ০.৪৯৯, যা উচ্চ বৈষম্য নির্দেশ করে।[১৯] এছাড়া দেশে সম্পদ বৈষম্য আয় বৈষম্যের দ্বিগুণ।[২০] কিন্তু কেন এমন হচ্ছে? দেশের অর্থনীতিবিদদের লেখা থেকে এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়। মইনুল ইসলাম লিখেছেন, বাংলাদেশের রাষ্ট্রচরিত্র হচ্ছে নব্য-ঔপনিবেশিক, আমলাতান্ত্রিক, প্রান্তিয় পুঁজিবাদী এবং পুঁজি লুণ্ঠনমূলক। এর ফলে দেশে অনুন্নয়নের দুষ্টচক্র দীর্ঘস্থায়ী হয়েছে। এই দুষ্টচক্রের মধ্যে রয়েছে ক্ষমতাসীন রাজনীতিবিদ ও আমলাদের দুর্নীতি ও লুটপাট, সরকারের প্রধানমন্ত্রীর একনায়কসুলভ একচ্ছত্র ক্ষমতা, সংঘাতমূলক দলীয় রাজনীতি, কালো অর্থনীতি ও কালো টাকার দৌরাত্ম্য এবং রাষ্ট্রক্ষমতাকে পুঁজি লুণ্ঠনের হাতিয়ার হিসেবে অপব্যবহার।[২১] এই আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট হিসেবে মইনুল ইসলাম লিখেছেন: *১৭৫৭ সালে বৃটিশ ইন্ডিয়া কোম্পানির উপনিবেশ হওয়ার ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশের রাষ্ট্র গত ২৫৯ বছর ধরে যে শোষণের ও পুঁজি লুণ্ঠনের হাতিয়ার হিসাবে ভূমিকা পালন করছে তা-ই দেশের অনুন্নয়নের প্রধান সঙ্ঘটক উপাদান। ১৭৫৭-১৯৪৭ পর্বের বৃটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ও সরাসরি বৃটিশ রাষ্ট্রের ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ, বঞ্চনা, বৈষম্য ও পুঁজি পাচার পর্ব পেরিয়ে এসে ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জনের পরও গত ৪৫ বছরে বাংলাদেশের রাষ্ট্রচরিত্রকে এই দুর্নীতি-লালনকারী ও পুঁজি-লুণ্ঠনকারীর অবস্থান থেকে আজো মুক্ত করা যায়নি। এদেশের রাষ্ট্র এখনো নব্য-ঔপনিবেশিক প্রান্তীয় পুঁজিবাদী রাষ্ট্র, আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্র এবং পুঁজি-লুটেরা রাষ্ট্রই রয়ে গেছে।*[২২]

তবে আন্তর্জাতিক পরিসরে দূর্বল ও নতজানু হলেও বাংলাদেশ রাষ্ট্র অভ্যন্তরীণ শাসনের ক্ষেত্রে কর্তৃত্ববাদী, নিপীড়ক ও স্বৈরাচারী ভূমিকা পালন করে। এখানে সরকার বিরোধী আইনানুগ তৎপরতাও রাষ্ট্রবিরোধী ষড়যন্ত্র

হিসেবে অভিহিত হয়ে যায়।[২৩] আনু মুহাম্মদের মতে, বিশ্বায়নের প্রভাবে বৈশ্বিক পুঁজির ব্যবস্থাপক প্রতিষ্ঠানগুলো বাংলাদেশের মত রাষ্ট্রগুলোতে নীতি প্রণয়নে মূখ্য ভূমিকা পালন করে। এর ফলে জনস্বার্থের সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলো রাষ্ট্র বাজারের হাতে ছেড়ে দেয়। অর্থাৎ রাষ্ট্রের ভূমিকা খুবই সংকুচিত। কিন্তু অন্যদিকে নানা ধরনের নিপীড়নমূলক শক্তি বৃদ্ধি করতে রাষ্ট্র সচেষ্ট থাকে। এর মাধ্যমে বাংলাদেশের অধিকাংশ ধনিক শ্রেণি এই দেশকে উপনিবেশ হিসেবে অর্থাৎ সম্পদ আহরণ বা টাকা বানানোর ক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহার করে এবং উদ্বৃত্ত অর্থ বিদেশে জমা করে।[২৪]

বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস অ্যাসোসিয়েশন এর তথ্যানুযায়ী, ২০২১-২২ অর্থবছরে প্রায় ৮৫ হাজার কোটি টাকার তুলা ও সুতা আমদানি করা হয়। কিন্তু একসময় ভারতীয় উপমহাদেশের কারিগররা বিশ্বের সর্বাধিক কাপড় উৎপাদন করতেন। এজন্য প্রয়োজনীয় তুলা ও অন্যান্য প্রাকৃতিক তন্তু এই অঞ্চলেই উৎপাদন করা হত। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শোষণে হারিয়ে যায় বাংলার এই বস্ত্র শিল্প। কারিগররা কাজ হারিয়ে কৃষিতে যোগ দেয়। কিন্তু ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি আর জমিদারদের অসীম চাহিদা মেটাতে জমির খাজনা ক্রমাগত বাড়তে থাকে। ব্রিটিশ শাসক ও কৃষকের মাঝে খাজনাভোগী জমিদার, জোতদার, তালুকদারদের সমন্বয়ে অনেকগুলো স্তর তৈরি হয়। এর পাশাপাশি শুরু হয় জোরপূর্বক নীল-আফিম-তামাকের মত অর্থকরী ফসল চাষ। ব্রিটিশরা চলে যাওয়ার দুই দশকের মধ্যে শিল্পায়িত কৃত্রিম রাসায়নিক উপকরণ নির্ভর কৃষির সরকারি প্রেসক্রিপশন প্রদান শুরু হয়। এই সবকিছু মিলিয়ে কৃষকসমাজ কৃষিতে আগ্রহ ও কৃষির উপর নিয়ন্ত্রণ উভয়ই হারিয়ে ফেলে। এর সাথে হারিয়ে যায় হাজার হাজার বছর ধরে সঞ্চিত কৃষি ও পরিবেশ বিষয়ক জ্ঞান, প্রথা ও চর্চা। কৃষি ও শিল্প উৎপাদন উভয়ই সম্পর্কহীণ ও বিদেশ নির্ভর হয়ে যায়। ফসল, নদীসহ ভৌগলিক ও সাংস্কৃতিক উপাদানগুলোর সাথে নির্ভরতার সম্পর্কগুলো ছিন্ন হয়ে যায়।

মুঘল আমলে বৈশ্বিক পণ্য উৎপাদনের প্রায় ১২ ভাগই হত সুবাহ বাংলায় (বর্তমান বাংলাদেশ এবং ইন্ডিয়ার পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যা)। কৃষিজ ফসল উৎপাদনের পাশাপাশি মৃৎশিল্প, কার্পাস বয়ন বা বস্ত্র শিল্প (সুতি, রেশম, মসলিন ইত্যাদি), জাহাজ নির্মাণ ও অন্যান্য কারিগরি শিল্পে বিশ্ব বিখ্যাত ছিল এ অঞ্চল। ফলে বহিরাগতরা বরাবরই দখল ও শাসন করতে চেয়েছে এই বদ্বীপ। কেবল অর্থনীতি নয়, রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রেও এই অঞ্চল

সমৃদ্ধ ছিল। অর্থাৎ এ অঞ্চলের মানুষ অসভ্য ছিল, ইউরোপীয়রা এসে তাদেরকে সভ্য ও শিক্ষিত বানিয়ে গেছে, এরকম একটা ধারণা যে চাপিয়ে দেওয়া হয় সেটা আসলে প্রশ্নসাপেক্ষ।

প্রাচীন ভারতে বর্ণপ্রথার পাশাপাশি সুশাসন চিন্তা ও প্রয়োগের সমৃদ্ধ ইতিহাস রয়েছে। ভারতবর্ষের মৌর্য বংশের সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন কৌটিল্য। তিনি প্রায় দুই হাজার বছর আগে অর্থশাস্ত্রের গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এটি ছিল মানব অনুশাসনের নীতি বিষয়ক প্রাচীন গ্রন্থ *মনুসংহিতার* ধারাবাহিকতা। অনেকের মতে কৌটিল্য রাষ্ট্র দর্শন বিষয়ে সমকালীন পাশ্চাত্য দার্শনিক এরিস্টটল বা প্লেটোর চেয়েও স্পষ্ট ও মৌলিক ছিলেন। রাজনীতি এবং প্রশাসনের এমন কোন দিক নেই যা তার গ্রন্থে আলোচিত হয়নি। পরবর্তীতে সম্রাট অশোকের শাসনামলে প্রজাগণের প্রদত্ত করকে ঋণ মনে করা হত এবং প্রজাদের উপকারে এই অর্থ খরচ করাকে উক্ত ঋণশোধের একমাত্র উপায় মনে করা হত। এছাড়া এসময় কৃষি, সাহিত্য, আয়ুর্বেদ ও ভেষজ চিকিৎসার প্রভূত উন্নতি হয়। সার্বিকভাবে সেসময় একটি কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কৌটিল্য রাষ্ট্রের অঙ্গগুলোকে মাত্র সাতটি শ্রেণিতে এমনভাবে বিভক্ত করেছিলেন যে, সেখানে কোন কিছুই বাদ ছিল না। কিন্তু বর্তমানে অর্ধশতাধিক মন্ত্রণালয় বা বিভাগ সৃষ্টি করেও নাগরিকের কল্যাণ নিশ্চিত করা যাচ্ছে না। সেসময় নৈতিকভাবে উঁচুমানের প্রশাসক দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালনার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছিল, যার মাধ্যমে সুশাসন কায়েম করা সম্ভব হয়। সব মিলিয়ে একটা স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক প্রশাসন ব্যবস্থা কার্যকর রাখার চেষ্টা জারি ছিল। কিন্তু বর্তমানে এসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পঠন, গবেষণা ও চর্চা অতি নগন্য।[২৫]

তাহলে পরবর্তীতে এ অঞ্চলের অধিকাংশ মানুষ অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিকভাবে পেছনে পড়ে গেল কিভাবে? রাষ্ট্র পরিচালনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে নাগরিক ও সরকারের মাঝে এত দূরত্ব কেন? এসব প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার জন্য বিশ্বের অর্থনীতি বা উৎপাদন প্রণালীর পরিবর্তনের ইতিহাসের দিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন। এক্ষেত্রে সব অঞ্চলে যে একই ঘটনা ঘটেছে তা নয়। নীহার কুমার সরকারের লেখা[২৬] থেকে বিভিন্ন অঞ্চলে উৎপাদন প্রক্রিয়ার বদলের প্রেক্ষিতে নানা ধরনের সামাজিক পটপরিবর্তনের একটা ধারাবাহিকতা পাওয়া যায়। যেমন আদিম সাম্যবাদী সমাজের বৈশিষ্ট্য ছিল গোত্রের সকলে মিলে সংগ্রহ ও ভোগ। অরণ্য বা

প্রকৃতি নির্ভর অর্থনীতি থেকে ক্রমে চাষাবাদ বা পশুপালনের উদ্ভব। কৃষি নির্ভর অর্থনীতিতে উৎপাদন বৃদ্ধি এবং গোত্রে গোত্রে সংঘাত থেকে দাসভিত্তিক সমাজের উদ্ভব হয়। ক্রমে কিছু অঞ্চলে জমিতে ব্যক্তিগত অধিকার স্থাপিত হয় এবং কিছু মানুষের হাতে অধিকাংশ জমি কুক্ষিগত হয়ে সামন্ত যুগের শুরু হয়। ক্রীতদাস ও ভূমিদাসদের শ্রমে পরগাছার মত সামন্ত রাজা ও জমিদাররা বেঁচে থাকতেন। অবসর সময় কাজে লাগিয়ে নানা ধরনের সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞানচর্চায় উন্নতি হলেও এই শাসকশ্রেণি বিলাসীতায় নিমজ্জিত হয়ে যায়। যেসব জায়গায় রাজা বা বড় জমিদার বাস করতেন, সেখানে ক্রমে শহর গড়ে উঠে। শহরে রাজার সৈন্য-সামন্ত ও কর্মচারীদের ব্যবহার্য জিনিস তৈরির জন্য গ্রামীণ কুটির শিল্পী বা কারিগররা শহরে পাড়ি জমায়। রাজা-রাণীদের বিলাসদ্রব্য তৈরি করেও তারা বেশ উন্নতি করে। ক্রমে কুটির শিল্পীদের সমিতি তৈরি হয়। শ্রমবিভাগ ও বিনিময় প্রথার প্রসারের ফলে পণ্য উৎপাদনও বৃদ্ধি পায়। বণিকরা স্থানীয় চাহিদা মিটিয়ে বাড়তি জিনিসপত্র দেশ-বিদেশে বিক্রি করে দিয়ে প্রচুর লাভ করতে থাকে। ক্রমে তারা কুটির শিল্পীদের দাদন বা অগ্রীম টাকা এবং কাঁচামাল যোগান দেওয়া শুরু করেন। বণিকদের উপর কুটির শিল্পীদের নির্ভরতা ক্রমে বাড়তে থাকে। পরিশেষে বণিকরা কারখানা চালু করে এবং কুটির শিল্পী-কারিগররা মজুর হিসাবে সেসব কারখানায় বেতনের বিনিময়ে খাটা শুরু করেন। অবস্থাপন্ন কুটির শিল্পীরাও তাদের কুটিরকে কারখানায় পরিণত করেন। অন্যদিকে গ্রামের চাষী এবং ভূমিদাসরাও জমিদারদের অত্যাচারে শহরে পাড়ি জমাতে থাকে। এতে গ্রামীণ কুটির শিল্পীদের পণ্য বিক্রি কমে যাওয়ায় তাদেরও গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে যেতে হয়। শহরের জনসংখ্যা ও শ্রমশক্তি বাড়তে থাকে এবং বড় বড় কারখানা তৈরি হয়। এসব কারখানায় নতুন নতুন কলকব্জা আবিষ্কার হয় এবং উৎপাদন আরও বৃদ্ধি পায়। এসব বাড়তি পণ্য বিক্রির জন্য প্রয়োজন হয় নতুন নতুন বাজার। নতুন বাজারের খোঁজে ইউরোপীয় বণিকরা সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। বণিকদের সাথে বিলাসীতার খরচ যোগাতে হিমশিম খাওয়া জমিদারদের শুল্ক সংক্রান্ত ঝামেলা বাঁধে। রাজার সাহায্য নিয়ে জমিদারদের পরাস্ত করে বিভিন্ন দেশে সরকার ব্যবস্থা কায়েম হয়। বণিকরা ক্রমে শহরগুলো কুক্ষিগত করে দেশের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয়। ইচ্ছামত আইন প্রণয়ন ও বড় বড় কোম্পানির মাধ্যমে বাণিজ্য ও যুদ্ধ পরিচালনা করে

তাদের মুনাফা বাড়াতে থাকে। কার্ল মার্কস তৎকালীন ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলোকে পুঁজিপতিদের ট্রেড ইউনিয়ন অ্যাখ্যা দিয়েছিলেন।

আফ্রিকার মানুষদের দাস হিসাবে কেনাবেচা এবং উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার সোনা-রূপার খনি লুট ও স্থানীয় আদিবাসীদের জমিতে বিশাল কৃষিক্ষেত তৈরি করে অসংখ্য মানুষের জীবন ধ্বংসের মাধ্যমে ইউরোপের বণিকরা তাদের পুঁজি বৃদ্ধি করতে থাকে। পুঁজির দৌলতে বড় বড় কারখানা তৈরি হতে থাকে এবং গ্রামছাড়া চাষী, ভূমিদাস ও কুটিরশিল্পীরা বাঁচার তাগিদে খুবই কম বেতনে এসব কারখানায় কাজে যোগ দিতে বাধ্য হয়। এভাবে পুঁজি ও শ্রমিক যোগাড়ের মাধ্যমে পুঁজিবাদী উৎপাদনের বিকাশ হতে থাকে। আর উৎপাদন যত বাড়ে কারখানা মালিকের পুঁজিও তত বাড়তে থাকে। কোম্পানি ও কারখানাগুলো ক্রমে আরও বড় হতে থাকে। পুঁজিবাদের নিয়তি অনুসারে বড় কোম্পানিগুলো ছোট কোম্পানিগুলোকে নানা উপায়ে গ্রাস করে ফেলে এবং একচেটিয়া কারবার কায়েম করে। এভাবে কিছু ব্যবসায়ী কোম্পানি, কারখানা ও ব্যাংক প্রকান্ড দৈত্যের আকার ধারন করে এবং ক্রমে পরস্পরের সাথে যুক্ত হয়ে বৃহত্তর দৈত্যের সৃষ্টি করে। উৎপাদনের সঙ্গে সরাসরি জড়িত না থেকে শুধুমাত্র শেয়ার কেনাবেচা করেই এক শ্রেণির মানুষ উৎপাদনের উপর প্রভাব বিস্তার করা শুরু করে। পুঁজিবাদী সমাজে যারা ধন-সম্পত্তি নিয়ন্ত্রণ করে, তাদের সংখ্যা ক্রমে কমে আসে এবং অল্প কিছু মানুষ অতি ধনীতে পরিণত হয়। এই প্রক্রিয়ায় তাদের এত বেশি মুনাফা হয় যে তা দেশের বাজারে আর খাটানোর সুযোগ থাকে না। তখন যেখানে কাঁচামাল ও মজুর সস্তায় পাওয়া যায় সেখানে পুঁজি রপ্তানি হতে থাকে। অর্থাৎ পুঁজিবাদের প্রথম যুগে পণ্য রপ্তানি হলেও, পরবর্তীতে পুঁজি রপ্তানিই প্রধান হয়ে পড়ে। কারণ এতে অধিক মুনাফা পাওয়া যায়। বিভিন্ন দেশে ব্যবসা করে সেখানকার সম্পদ ও শ্রমশক্তি শোষণ করা এসব কোম্পানিকে বহুজাতিক কোম্পানি বলা হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সাম্রাজ্যবাদী দেশের বহুজাতিক কোম্পানিগুলো সারা বিশ্বে তাদের শাখাপ্রশাখার জাল আরও বিস্তার করে। উদাহরণস্বরূপ দুইশো বছর ঔপনিবেশিক শোষণের পর ভারতীয় উপমহাদেশকে নির্মমভবে ভাগ করে ব্রিটিশরা শারীরিকভাবে চলে গেলেও সেদেশের *ইউনিলিভার* কোম্পানির পণ্যে বর্তমানে এ অঞ্চলের দোকানগুলো সয়লাব হয়ে আছে। এমনকি এসব পণ্য উৎপাদন ও ব্যবহারের মাধ্যমে পানি দূষিত করে আবার সেই পানি বিশুদ্ধ করার ফিল্টারও তারা বিক্রি করে।

এভাবে পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের সমন্বয়ে বিগত ৫০০ বছরে ইউরোপের কিছু দেশ সারা পৃথিবী জুড়ে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। কিন্তু ক্রমাগত পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও বাজার দখলের তীব্র প্রতিযোগিতায় ইউরোপের দেশগুলোর পুঁজিপতি ও বণিকদের দ্বন্দ্ব চূড়ান্ত রূপ নেয় এবং বিশ শতকে দুইটি ভয়ংকর বিশ্বযুদ্ধ সংগঠিত হয়। পুরো পৃথিবীর মানুষ মোটামুটি দুই ভাগে ভাগ হয়ে একে অপরকে ধ্বংস করতে মেতে উঠে। তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি প্রসঙ্গে এম এন রায় লিখেছেন, *ক্ষমতার রাজনীতির উদ্দেশ্য চরিতার্থের জন্য মানুষ চিন্তাশক্তিহীন পশুর স্তরে নেমে যায়। জনগণের বিচার-বুদ্ধির নিকট আবেদন না জানিয়ে বরং তাদের আবেগ ও কুসংস্কারের নিকট আবেদন জানালে তাদের সহজেই আন্দোলিত করা যায়। সুতরাং জনগণকে পেছনে ফেলে রাখাটাই হচ্ছে আধুনিক গণতান্ত্রিক রাজনীতির ফলাফল। .. সুতরাং গণতন্ত্র সবক্ষেত্রেই একটি প্রবঞ্চনাকর রাজনৈতিক বক্তৃতায় অধঃপতিত হয়েছে। বিকল্প হিসাবে ভয়াবহ বিপ্লবের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল এবং এরপর ওপর থেকে সামাজিক পরিবর্তন চাপিয়ে দেওয়াটাও অধিক মঙ্গলজনক ফলের জন্ম দিতে পারেনি।*[২৭]

এমনিতে উপনিবেশগুলোতে দূর থেকে সরাসরি শাসন জারি রাখতে অনেক হাঙ্গামা ও খরচ হয়। এর চেয়ে আড়ালে থেকে বহুজাতিক কোম্পানির মাধ্যমে নানা ধরনের ব্যবসা, শিল্প, আর্থিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান চালু করে বাজার, শ্রমশক্তি ও প্রাকৃতিক সম্পদ শোষণ করা নিরাপদ। জাতিসংঘের হিসাবে বহুজাতিক কোম্পানিগুলো ১৯৬৭ সালে ৬১টি অনুন্নত দেশে ১২০ কোটি ডলার পুঁজি পাঠিয়ে ৪৪৪ কোটি ডলার লাভ করেছিল। পরবর্তী দশকে ১৯৭৪ সালে ২১০ কোটি ডলার পুঁজির বিনিময়ে ১,৬৪০ কোটি ডলার লাভ করেছিল। এই মুনাফা অব্যাহত রাখার জন্য বিশ্ব ব্যাংক, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল বা আইএমএফ, সবুজ বিপ্লব, বিশ্বায়ন, গ্যাট চুক্তি, মুক্তবাজার অর্থনীতি, ট্রিপস, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা, নয়া উদারতাবাদী অর্থনীতি ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান, কাঠামো ও ভাবাদর্শ তৈরি ও চাপিয়ে দেওয়া হয়।

ফলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকতা থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন গণতান্ত্রিক দেশে রূপান্তরিত হওয়ার পরও স্থানীয় জনগণের মতামতের চেয়ে ধনী রাষ্ট্রগুলোর চাপিয়ে দেওয়া একরৈখিক উন্নয়নের মডেলগুলো (কৃষি→শিল্প→সেবা) বাস্তবায়নই মূখ্য হয়ে দাড়ায়। জনগণের সেবা প্রদানের জন্য প্রতিষ্ঠিত সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো স্থানীয় শিল্পের বিকাশে অগ্রাধিকার না দিয়ে বহুজাতিক কোম্পানির এজেন্সি বা ডিলার হিসাবে কাজ

করতে থাকে। ১৯৬০-৭০ এর দশকে খাদ্য নিরাপত্তার কথা বলে কৃষিতে সবুজ বিপ্লবের প্রযুক্তিগুলো চাপিয়ে দেওয়া শুরু হয়। তখন থেকে বাংলাদেশের সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো এসব প্রযুক্তির বাস্তবায়ন ও প্রসারে কাজ করে চলেছে। সেসময় থেকে উচ্চফলনশীল বীজ, রাসায়নিক সার, বালাইনাশক বিষ, সেচ, বিদ্যুৎ ইত্যাদি নিয়ে বিশাল কর্মযজ্ঞ শুরু হয়েছিল। এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় জনবল সরবরাহের জন্য প্রতিষ্ঠা করা হয় কৃষি ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিরন্তর প্রয়াসে কৃষকদের আদি কৃষিজ্ঞান, সংস্কৃতি, স্থানীয় বীজ ও পরিবেশ ব্যবস্থাপনাকে উপেক্ষা করে শিল্পনির্ভর রাসায়নিক কৃষির প্রসার ঘটে। কিন্তু রাসায়নিক বর্ষন শুরু হওয়ার ৫০ বছর পরও দেশের ১ কোটি পরিবারকে (যাদেরকে নিম্ন আয়ের পরিবার বলা হয়) ভর্তুকি মূল্যে খাদ্য সরবরাহ করতে হচ্ছে। বাজারমূল্যে খাদ্য ক্রয় করার ক্ষমতা তাদের নেই। এজন্য এসব পরিবারকে স্মার্ট কার্ড দেওয়া হয়েছে। সরকারি প্রতিষ্ঠান *ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ* (*টিসিবি*) এই খাদ্য ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করে। *টিসিবি*-র স্মার্ট কার্ডধারী ভোক্তারা ডিলারদের কাছ থেকে বাজারদরের চেয়ে কম দামে চাল, মসুর ডাল, সয়াবিন বা রাইসব্রান তেল, চিনি ও পেঁয়াজ কিনতে পারেন। এক্ষেত্রে রাইসব্রান তেল সাম্প্রতিক সংযোজন, আগে মূলত সয়াবিন তেলই বিক্রি হত। যাই হোক এসব খাদ্যপণ্য *টিসিবি* বিভিন্ন কোম্পানির কাছ থেকে ক্রয় করে স্থানীয় ডিলারদের মাধ্যমে ভোক্তাদের কাছে সাশ্রয়ী মূল্যে সরবরাহ করে। দেশ খাদ্যে স্বয়ংস্বম্পূর্ণ- এরকম একটা গল্প বলা হলেও চাল ও রাইসব্রান তেল ছাড়া টিসিবির বাকি পণ্যগুলো জনগণের করের টাকা খরচ করে বিদেশ থেকে কিনে আনতে হয়। অর্থাৎ একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান জনগণের সাথে বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর সংযোগ ঘটিয়ে দিচ্ছে। এতে যেসব জায়গায় এসব কোম্পানির পণ্য বিক্রি করার মত বাজার গড়ে উঠেনি, সেখানেও তাদের পণ্য পৌছে যাচ্ছে। এটাকে বিশ্বায়নের প্রাতিষ্ঠনিকীকরণ বলা যায়। এর মাধ্যমে নিজস্ব কৃষি পরিসর ও খাদ্য ব্যবস্থা ধ্বংস করে বিদেশী কৃষি উপকরণ ও আমদানি নির্ভর অনিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থা চালু হয়েছে।

শিল্পায়িত কৃষির আদর্শ মোতাবেক সামাজিক-সাংস্কৃতিক-পরিবেশগত প্রেক্ষাপট বিবেচনা না করে শুধু অধিক উৎপাদন ও অর্থনৈতিক লাভকে প্রাধান্য দেওয়ায় বৈচিত্র্যপূর্ণ খাদ্য ও কৃষিফসলের পরিবর্তে দেশের বিস্তীর্ণ

অঞ্চলে এখন ভূট্টার মত অল্প কিছু ফসল চাষ হচ্ছে। পুরো পৃথিবীতেই ভূট্টার পেছনে ব্যাপক বিনিয়োগ। সহজেই বিক্রি করতে পারায় বাংলাদেশেও কৃষকরা ব্যাপকভাবে ভূট্টা আবাদে ঝুঁকেছেন। বিশ্বের বড় বড় কোম্পানি এদেশে তাদের প্যাটেন্ট করা ভূট্টা বীজ বিক্রি করছে। আর কৃষকরা ভর্তুকি মূল্যে রাসায়নিক সার কিনে ভূট্টা চাষ করছেন। সরকারিভাবে রাসায়নিক সারে যে ব্যাপক পরিমাণ ভর্তুকি দেওয়া হয় তার যোগানও জনগণের করের টাকা থেকেই আসে। কিন্তু মানুষ সরাসরি এই ভূট্টা খায় না। এসব ভূট্টা মূলত পোল্ট্রি মুরগি, চাষের মাছ এবং গবাদিপশুর খাদ্য। এর মাধ্যমে বাজারে সুলভে ব্রয়লার মুরগি বা চাষের মাছের যোগান অব্যাহত থাকে। সীমিত আয়ের মানুষদের এসব খেয়েই বেঁচে থাকতে হয়। অন্যদিকে তুলনামূলক স্বচ্ছল ও বিত্তশালী পরিবারগুলোর জন্য বিদেশি ফল, ভিনেগার, অলিভ অয়েল ইত্যাদি ব্যয়বহুল খাদ্যপণ্য ও অন্যান্য ভোগ্যপণ্যের চাহিদা মেটাতে বিদেশী পণ্যের পসরা সাজিয়ে গড়ে উঠছে একের পর এক সুপার শপ ও সুপার মার্কেট। রাসায়নিক কৃষির এত বিপুল কর্মযজ্ঞ দেশের মানুষের টেকসই খাদ্য ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে পারেনি। বরং ভোগবাদের সাথে মিলেমিশে পুরো দেশে কৃত্রিম হরমোননির্ভর বিষাক্ত খাদ্য পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। আধুনিক খাদ্য ব্যবস্থার অনুষঙ্গ হিসাবে ফাস্টফুড, কোমল পানীয়, পাউরুটি, চিপসের মত অতি প্রক্রিয়াজাতকৃত ও অস্বাস্থ্যকর খাদ্যে সয়লাব হয়ে যাচ্ছে শহর ও গ্রামের দোকানগুলো। এর পাশাপাশি স্বাস্থ্য খাতের বাণিজ্যিকীকরণের ফলে অ্যালোপ্যাথিক ঔষুধ ও এন্টিবায়োটিকের নির্বিচার ব্যবহার মানুষের ভোগান্তির মাত্রাকে এক অনন্য পর্যায়ে নিয়ে গেছে। বাংলাদেশে প্রতি বছর প্রায় দেড় থেকে দুই লাখ মানুষ ক্যানসারে আক্রান্ত হচ্ছেন।[২৮] ব্যয়বহুল ও অপ্রতুল স্বাস্থ্যসেবার কারণে প্রতি ৩ জন ক্যানসার রোগীর ২ জনই বিনা চিকিৎসায় মারা যান।[২৯]*জাতীয় কিডনি ইনস্টিটিউটের* হিসাবে প্রায় ২ কোটি মানুষ কিডনি রোগে আক্রান্ত।[৩০]আর দেশের ৩৪ শতাংশ মানুষের মৃত্যু ঘটে হৃদরোগে।[৩১] এছাড়া ৩৫ বছরের ওপরে অর্ধেক মানুষের উচ্চ রক্তচাপ আছে। সার্বিকভাবে দেশের ১০ জনের মধ্যে ৭ জনের মৃত্যু ঘটে উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, ক্যানসারসহ কয়েকটি অসংক্রামক রোগে।[৩২]

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, রাষ্ট্র বা পলিটিক্যাল কমিউনিটি মানুষকে কিভাবে এই ধরনের শোষণমূলক ও আত্মঘাতি উৎপাদন সম্পর্কে নিয়োজিত থাকতে

বাধ্য করে? যুবরা কেন কাজের খোঁজে নিজের জীবন ও যাপনের সাথে সম্পর্কহীন অফিস বা কারখানার দ্বারে দ্বারে ঘুরতে থাকেন? কেন প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে শ্রমিকরা কাজ করতে হাজির হন এবং তার সন্তানকেও পরবর্তী শ্রমশক্তি হিসাবে প্রস্তুত করেন? মানুষ কেন শ্রেণি বৈষম্যে নিমজ্জিত সমাজকে মেনে চলতে সম্মত হয়? এ প্রসঙ্গে কার্ল মার্কস লিখেছেন, যেকোন সমাজে একটা উৎপাদন সম্পর্ক থাকে এবং উৎপাদনী শক্তিগুলো ঐ উৎপাদন সম্পর্কের অধীনে কাজ করে। আধুনিক সমাজে রাষ্ট্রের মাধ্যমে শাসকশ্রেণি মেহনতিশ্রেণির ওপর এই আধিপত্য বিস্তার করে। রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রযন্ত্র শ্রমিকশ্রেণির শ্রমের উদ্বৃত্তমূল্য আহরণে শাসকশ্রেণিকে সক্ষম করে তোলে। আর রাষ্ট্রযন্ত্রের অস্তিত্ব যুক্ত হয়ে আছে পুলিশ, আদালত, প্রশাসন, সরকার ইত্যাদি নিপীড়নমূলক কলকব্জার সাথে। এগুলোর মাধ্যমে বিদ্যমান রাজনৈতিক কাঠামো টিকে থাকে। তবে যেকোন রাষ্ট্রের অধিপতি শ্রেণির স্বার্থের জন্য সবচেয়ে জরুরি বিষয় হলো উৎপাদন এবং পুনরুৎপাদন নিশ্চিত করা। কারন শ্রমিকরা কাজ করতে না আসলে তো তাদের পণ্য উৎপাদন বা মুনাফা কোনটাই হবে না। লুই আলথুসের এর মতে, রাষ্ট্রের ভাবাদর্শিক হাতিয়ারগুলো (শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, পরিবার, আইন, রাজনৈতিক দল, ট্রেড ইউনিয়ন, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, টিভি-পত্রিকা ইত্যাদি) এই পুনরুৎপাদন নিশ্চিত করে। যে শাসক শ্রেণি রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে থাকে তার ভাবাদর্শই এসব হাতিয়ারের মূল ভিত্তি। আর ভাবাদর্শ হচ্ছে রাষ্ট্রের আড়াল করে রাখা মূল ক্ষমতা। আন্তোনিও গ্রামসির মতে, প্রত্যেক শ্রেণি তার ভাবাদর্শের সাথে মিল রেখে আধিপত্যের কলকব্জা গড়ে তোলে এবং শক্তি প্রয়োগ ও সম্মতি উৎপাদনের মধ্য দিয়ে বিশেষ ধরনের উৎপাদন সম্পর্কে মানুষকে বাধ্য করে। এভাবে নিপীড়নমূলক ও ভাবাদর্শিক হাতিয়ারের সমন্বয়ে রাষ্ট্র শাসকশ্রেণির পক্ষে কাজ করে চলে।[৩৩]

অন্যদিকে বিশ্ব ব্যাংক ও এধরনের প্রতিষ্ঠানগুলো উন্নয়নশীল দেশগুলোর অর্থনীতির গতিপ্রকৃতি কমবেশি ঠিক করে দেয় এবং জোর খাটিয়ে এসব দেশের বাজারকে বৈশ্বিক পুঁজির কাছে উন্মুক্ত করে দেয়। তবে বর্তমানে স্থানীয় আমলারাই এসব কাজে দক্ষ হয়ে উঠেছেন। তড়িঘড়ি করে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ শুরু করে পরবর্তীতে প্রকল্প ব্যয় কয়েক গুণ বাড়িয়ে নেওয়া হয়। এর পাশাপাশি বিশাল কোম্পানি ও কর্পোরেশনগুলো উদ্বৃত্ত অর্থ শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধিতে ব্যয় না করে নানা ধরনের ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা

করে। এসব ফাউন্ডেশন স্থানীয় এনজিও, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং সাংস্কৃতিক পরিসরে আর্থিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক সহায়তা প্রদান করতে থাকে। সরকার, রাজনৈতিক দল, আদালত, সংবাদ মাধ্যম ইত্যাদিকে বশে আনার ক্ষেত্রেও এসব কর্পোরেট বদান্যতাপুষ্ট ফাউন্ডেশনগুলো প্রভাব রাখে। এছাড়া নাগরিক অধিকার, ন্যায্যতা ও পরিবেশ আন্দোলনকে প্রশমিত এবং বিচ্যুত করতেও তারা ভূমিকা রাখে। এসব ফাউন্ডেশনের কিছু কল্যাণমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে এগুলোর কর্ণধার পুঁজিপতিরা ক্রমে বিশ্বের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি প্রভৃতির নীতি নির্ধারণের অধিকার পেয়ে যায়।[৩৪]

প্রায় ২৫০ বছরের ঐতিহাসিক তথ্য বিশ্লেষণ করে টমাস পিকেটি দেখিয়েছেন, সম্পদ যার যত বেশি, বিনিয়োগ থেকে আয় বা সম্পদ বৃদ্ধির হারও তার তত বেশি। আর পুঁজিবাদী বিশ্বে বিনিয়োগকৃত মূলধন থেকে যে হারে আয় হয় সেই হারে অর্থনৈতিক উন্নয়ন হয় না। এটি বিভিন্ন দেশের সম্পদ অব্যবস্থাপনা, সম্পদের অসম বন্টন এবং সামগ্রিক অসমতা বৃদ্ধির অন্যতম কারণ। তবে ঐতিহাসিক পরিসরে অসমতা বৃদ্ধির মূল কারণ অর্থনীতি বা প্রযুক্তি নয়, বরং তা আদর্শিক ও রাজনৈতিক।[৩৫]

পশ্চিম ইউরোপের দর্শনে মানুষ প্রকৃতির অংশ নয়। বরং প্রকৃতি মানুষের অধীন। মানুষের জন্যই প্রকৃতির সৃষ্টি। এই দর্শনের আদি উৎস বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্ট, যেখানে বলা হয়েছে ঈশ্বর মানুষকে সব প্রাণীর উপর প্রভুত্ব করতে নির্দেশ দিয়েছেন। অনেকের মতে এই পাশ্চাত্য দর্শন পুঁজিবাদী অর্থনীতির ভিত্তি। এই অর্থনীতিতে প্রকৃতি কেবল কাঁচামালের উৎস এবং প্রাকৃতিক উপাদানগুলোকে বলা হয় প্রাকৃতিক সম্পদ। তাদের দর্শনে অরণ্য এবং অরণ্যনির্ভর মানুষ বর্বর ও অসভ্য। শিকার ও সংগ্রহ হচ্ছে আদিম, অসভ্য, বর্বর যুগের অর্থনীতি। এর থেকে কৃষিনির্ভর গ্রামীণ সভ্যতা উন্নত। আর শিল্পনির্ভর নগর সভ্যতা আরও উন্নত। এজন্য দুনিয়ার তাবৎ অসভ্য ও বর্বর জনগোষ্ঠীকে ইউরোপের মত সুসভ্য করা শ্বেতাঙ্গদের দায়। সভ্যতার এই ভাবাদর্শে ইউরোপীয় উপনিবেশের মানুষরাও দীক্ষিত হয়েছে। ভারতীয় উপমহাদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় এই দর্শন এমনভাবে গেড়ে আছে যে একে প্রশ্ন করার ধৃষ্টতা অধিকাংশ আধুনিক শিক্ষিত মানুষের মধ্যে নেই। ফলে কৃষকের সন্তান কৃষিকাজ ছেড়ে শহরের কারখানায় বা অফিসের সভ্য কাজে যোগ দিতে সর্বস্ব উজাড় করে দেয়।[৩৬] চাকরীমূখী ও শহরমূখী

শিক্ষা ব্যবস্থার ফলে স্থানীয় শিল্পের বিকাশের চেয়ে বিদেশী পণ্যের প্রতি আগ্রহ তৈরি হয়। ফলে বাংলাদেশের বিজ্ঞানী কুদরাত-এ-খুদার নেতৃত্বে পাট ও পাটকাঠি থেকে কাগজ, বোর্ড, তেল, রেয়ন ইত্যাদি তৈরির যে সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল সেগুলোর বিকাশের মাধ্যমে শিল্পের সাথে কৃষির সৃজনশীল যোগাযোগ স্থাপন সম্ভব হয়নি।[৩৭] বরং ক্রমে পাটশিল্প ধ্বংস করার পথে এগিয়েছে দেশ।[৩৮] বিজ্ঞান মানে যে শুধু রোবট তৈরি করা নয়, বরং তুলসী, বিষকাটালী, গুলঞ্চ, কালমেঘ, তেলাকুচা ইত্যাদি ভেষজ উদ্ভিদ এবং গুড়ের মত স্থানীয় জিনিসের মৌলিক গবেষণাও যে বিজ্ঞানের অন্তর্ভূক্ত তার বোধ ব্যাপক পরিসরে তৈরি হয়নি। সার্বিকভাবে বর্তমান বৈশ্বিক পরিস্থিতি প্রসঙ্গে ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদের সাথে একমত হওয়ার যায়, তিনি লিখেছেন, *বর্তমান বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নিয়ে বিশ্বব্যাপী ব্যাপক অসন্তোষ তৈরি হচ্ছে। আর্থিক খাতের অস্থিতিশীলতা, প্রাচুর্যের পাশাপাশি চরম বৈষম্য ও বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর ক্রমবর্ধমান আধিপত্য এ ব্যবস্থাকে প্রশ্নবিদ্ধ করছে।*[৩৯] আর এরকম বৈশ্বিক পরিস্থিতিতে *অকুপাই ওয়ালস্ট্রিট*-এর মত নানা বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন ক্রমে তীব্র হয়ে উঠছে।[৪০]



ছবি ঃ বিত্তের প্রাচুর্য ও হাহাকার পাশাপাশি অবস্থান

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

আন্তর্জাতিক টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়নের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি উন্নয়ন সূচক ২০২৩-এ ১৭৫টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১৪৫।[৪১] প্রতিবেশী দেশগুলোর মধ্যে শ্রীলঙ্কা ১১৬, ভুটান ১১৭, ইন্ডিয়া ১৩৮, মায়ানমার ১৪০, নেপাল ১৪২, পাকিস্তান ১৪৬ এবং আফগানিস্তান ১৬৪তম অবস্থানে আছে। এই সূচকে প্রথম ও দ্বিতীয় অবস্থানে আছে দক্ষিণ কোরিয়া ও ডেনমার্ক। প্রাচ্যের বড় অর্থনীতির দেশ হংকং, জাপান, নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, সিংগাপুর, ম্যাকাও- প্রত্যেকেই এক্ষেত্রে সামনের সারিতে আছে। এছাড়া পশ্চিমের উচ্চ আয়ের দেশগুলো এক্ষেত্রেও এগিয়ে আছে। বাংলাদেশের ১৪.৪ ভাগ মানুষ ইন্টারনেট ব্যবহার করে। এর মধ্যে ব্রডব্যান্ড ব্যবহারকারির হার মাত্র ২.৪ ভাগ।

বর্তমানে বিশ্বে ইন্টারনেটে সংযুক্ত বা অনলাইনে থাকা মানুষের হার প্রায় ৬৭ ভাগ, যা ২০০৫ সালে ছিল মাত্র ১৬ ভাগ, ২০১০ সালে ছিল ২৯ ভাগ এবং ২০১৫ সালে ছিল ৪০ ভাগ।[৪২] সংখ্যার হিসাবে ২০০৫ সালে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা ছিল ১০০ কোটি, ২০১০ সালে ২০০ কোটি, ২০১৫ সালে ৩০০ কোটি, ২০২০ সালে ছিল ৪৬০ কোটি এবং ২০২৩ সালে হয়েছে প্রায় ৫৪০ কোটি। এর বিপরীতে ইন্টারনেট যোগাযোগের বাইরে বা অফলাইনে আছে এমন মানুষের সংখ্যা ২৬০ কোটি, যা মোট জনসংখ্যার ৩৩ ভাগ। ইন্টারনেট ব্যবহার মূলত নির্ভর করে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উপর। উচ্চ-আয়ের দেশে ৯৩ ভাগ, অর্থাৎ ১০ জনের মধ্যে ৯ জন মানুষই ইন্টারনেটে যুক্ত। কিন্তু এই হার নিম্ন-আয়ের দেশে মাত্র ২৭ ভাগ। উচ্চ ও নিম্ন আয়ের দেশের এই পার্থক্য থেকে আন্তঃরাষ্ট্রীয় ও আঞ্চলিক পরিসরে ডিজিটাল বিভাজন বা বৈষম্যের উচ্চ মাত্রা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। ইউরোপে জনসংখ্যার ৯১ ভাগ ইন্টারনেট ব্যবহার করে, অথচ আফ্রিকায় এই হার মাত্র ৩৭ ভাগ। এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের ৬৬ ভাগ মানুষ এই জালের সাথে যুক্ত। বিশ্বের তাবৎ পুরুষের ৭০ ভাগ ইন্টারনেট ব্যবহার করলেও নারীদের ক্ষেত্রে এই হার ৬৫ ভাগ। উচ্চ আয়ের দেশগুলো এক্ষেত্রে সমতা বিধান করতে পারলেও স্বল্প আয়ের দেশগুলো এখানেও পিছিয়ে। বিশ্বের শহরাঞ্চলের ৮১

ভাগ এবং পল্লী অঞ্চলের ৫০ ভাগ মানুষ ইন্টারনেট ব্যবহার করে। ইউরোপ-আমেরিকাতে শহর ও গ্রামে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা কাছাকাছি হলেও এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল এবং আফ্রিকার ক্ষেত্রে বিস্তর ফারাক দেখা যায়। নিম্ন আয়ের দেশে শহর এবং গ্রামে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর হার যথাক্রমে ৪৭ এবং ১৭ ভাগ। অর্থাৎ আয় যত বেশি এই পার্থক্য তত কম হয়। তবে বিশ্বে ১৫-২৪ বছর বয়সীদের প্রায় ৭৯ ভাগ ইন্টারনেট ব্যবহার করে, যেখানে অন্য বয়সীদের মধ্যে এই হার ৬৫ ভাগ। উচ্চ আয়ের দেশের ১৫-২৪ বছর বয়সীদের ৯৮ ভাগ, উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশের ৯৬ ভাগ এবং নিম্ন-মধ্য আয়ের দেশের ৭১ ভাগ ইন্টারনেটে সংযুক্ত। আর নিম্ন আয়ের দেশের যুবদের ক্ষেত্রে এই হার ৪৫ ভাগ, যা অন্য বয়সীদের দ্বিগুণ।[৪৩]

বিশ্বে বর্তমানে মোবাইল সংযোগের সংখ্যা ৮৯০ কোটি, যা তাবৎ মানুষের সংখ্যার চেয়ে বেশি। উচ্চ আয়ের দেশগুলোতে প্রতি ১০০ জন মানুষের বিপরীতে ১৩০টি মোবাইল সাবস্ক্রিপশন আছে, যা স্বল্প আয়ের দেশের ক্ষেত্রে ৬৫টি। বিশ্বে ১০ বছরের বেশি বয়সী ৭৮ ভাগ মানুষের মোবাইল ফোন আছে। ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যার চেয়ে এই হার ১১ ভাগ বেশি। ইউরোপ ও অন্যান্য ধনী দেশের জনসংখ্যার ৯৪ ভাগের মোবাইল ফোন থাকলেও, নিম্ন আয়ের দেশের ৪৭ ভাগ মানুষের মোবাইল ফোন আছে। তবে পুরুষদের তুলনায় নারী মোবাইল গ্রাহকের হার ৮ ভাগ কম। বর্তমানে বিশ্বের ৯০ ভাগ মানুষ চতুর্থ প্রজন্ম বা ৪জি (4G) নেটওয়ার্কের আওতাভুক্ত। উচ্চ আয়ের দেশের ৮৯ ভাগ মানুষ ৫জি-র আওতাভুক্ত হলেও বৈশ্বিক পরিসরে এই হার ৪০ ভাগ। এমনকি স্বল্প আয়ের দেশে ৫৫ ভাগ মানুষের কাছে এখনও ৪জি প্রযুক্তি পৌছায়নি। তারা মূলত ২জি বা ৩জি এর উপর নির্ভরশীল। অথচ ইউরোপে ২০২৫ এর শেষ নাগাদ অনগ্রসর প্রযুক্তি হিসাবে ৩জি নেটওয়ার্কই বন্ধ করে দেওয়া হতে পারে।

অন্যদিকে ২০২০ সালের কোভিড-১৯ মহামারী মানব সমাজকে নানা ধরনের কঠিন পরীক্ষায় ফেলেছিল। সেসময় করোনাভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে লকডাউন ও নানা রকম নিষেধাজ্ঞা আরোপের মাধ্যমে মানুষের চলাচল সীমাবদ্ধ করা হয় এবং মানবসমাজে গেড়ে বসা সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যগুলো আরও প্রকটভাবে ধরা পড়তে থাকে। তবে মানুষের উৎপাত ছাড়া পরিবেশ যে কত ভাল থাকে সেটাও দেশে দেশে দৃশ্যমান

হতে থাকে। সেসময় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও শিক্ষার্থীদের শারীরিক উপস্থিতি নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়। এর বিকল্প হিসাবে টেলিভিশন ও অনলাইন মাধ্যম ব্যবহার করে চালু হয় দূরশিক্ষণ। বাংলাদেশের জনসংখ্যার ৫ ভাগের ২ ভাগ শিশু, অর্থাৎ ১৮ বছরের কম বয়সী। *বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো* ও *ইউনিসেফ* এর ২০২১ সালের শিশুদের শিক্ষা বিষয়ক জরিপে দেখা গেছে, কোভিড-১৯ মহামারীর সময় যেসব শিশুর ইন্টারনেট ও টেলিভিশন ব্যবহারের সুযোগ সীমিত ছিল এবং যাদের বাড়িতে কম্পিউটার বা স্মার্টফোনের মত ডিভাইসের অভাব ছিল, তারা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। শহরের শিশুদের ২৮.৭ ভাগ এবং গ্রামের ১৫.৯ ভাগ শিশু তৎকালীন দূরশিক্ষণ ক্লাসে অংশগ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছিল। এর মধ্যে খুলনা ও ঢাকা বিভাগের ২৩ ভাগ শিশু অংশগ্রহণ করলেও ময়মনসিংহের মাত্র ৫.৭ ভাগ শিশু অংশগ্রহণ করেছিল। অর্থাৎ প্রযুক্তি যন্ত্রের অভাবে ছোটকাল থেকেই বঞ্চিত হয়েছে শিশুদের বিশাল একটা অংশ। বা বলা ভাল প্রযুক্তি যন্ত্রে প্রবেশাধিকারের সুযোগ পাওয়ায় এক শ্রেণির শিশু অন্যদের চেয়ে যুগের সাথে বেশি তাল মিলাতে পারছে। আন্তর্জাতিক বা জাতীয় কোন পরিসরেই প্রযুক্তির ব্যবহার সুষম নয়। উপরন্তু এসব প্রযুক্তি এবং প্রযুক্তিযন্ত্রের মালিকানা বা প্যাটেন্ট অল্প কিছু কোম্পানির কাছে কুক্ষিগত।[৪৪] এসব কোম্পানি নানা দেশে তাদের কার্যক্রম বিস্তার করে আছে। ২০২১ সালে পৃথিবীর মোট প্যাটেন্ট আবেদনের অর্ধেক হয়েছিল চীনে এবং মোট আবেদনের ৮৮ ভাগ হয়েছিল মাত্র ১০টি ধনী দেশে। ২০২০ সাল অবধি সবচেয়ে বেশি প্যাটেন্টপ্রাপ্ত কোম্পানিগুলো হচ্ছে *স্যামসাং*, *আইবিএম*, *ক্যানোন*, *মাইক্রোসফট*, *রবার্ট বশ জিএমবিএইচ*, *প্যানাসনিক*, *এলজি*, *জেনারেল ইলেকট্রিক*, *ইন্টেল*, *সিমেন্স*, *টয়োটা*, *সনি*, *অ্যালফাবেট*, *হিটাচি*, *কুয়াল কম*, *রেদন টেকনোলজিম*, *হন হাই প্রিসিশন ইন্ডাস্ট্রি* প্রভৃতি। এগুলোর অধিকাংশই তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ও ইলেকট্রনিক্স কারবারের সাথে জড়িত। অর্থাৎ আধুনিক প্রযুক্তির প্রসার ও নতুন উদ্ভাবনের জন্য প্রয়োজনীয় ইতোমধ্যে আবিস্কৃত প্রযুক্তিগুলোর প্যাটেন্ট আরোপের মাধ্যমে এসব কোম্পানি সমাজে এক ধরনের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি নিজেদের অসীম মুনাফার সম্ভবনা তৈরি করেছে। জ্ঞান থেকে যেমন ক্ষমতা তৈরি হয়, তেমনি ক্ষমতা থেকেও জ্ঞান তৈরি হওয়ার নজির আছে। এতে জনগণকে বাধ্য হয়ে বা স্বেচ্ছায় ক্ষমতা থেকে তৈরি হওয়া জ্ঞানকে স্বীকৃতি দিতে হয় বা গ্রহণ করতে হয়। তবে এর বিপরীতে

লিন্যাক্স-এর মত ওপেন সোর্স বা মুক্ত সফটওয়্যার এবং উইকিপিডিয়ার মত মুক্ত এনসাইক্লোপিডিয়া রয়েছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯৫০-এর দশকে *কলম্বো প্রজেক্টের* আওতায় তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে প্রথম কম্পিউটার আসে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে তখনকার উন্নত দেশগুলো সারা বিশ্বে শিল্প ও রাসায়নিক কলকারখানা, বাঁধ, সড়ক, সেতু ইত্যাদি অবকাঠামো নির্মাণ ও প্রযুক্তি প্রেরণের মাধ্যমে উন্নয়ন কার্যক্রম ও ঋণ প্রদান শুরু করে। এই ধারাবাহিকতায় বর্তমানে মাধ্যমিক স্তর বা ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে 'ডিজিটাল প্রযুক্তি' নামক পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে বাংলাদেশে শিক্ষার্থীদের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি পাঠ শুরু হয়। এর মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক পরিসরে শিক্ষার্থীরা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক পঠন ও চর্চার সাথে যুক্ত হয়। উপরের শ্রেণিতে উঠার সাথে সাথে ক্রমে এই সম্পৃক্ততা আরও বাড়তে থাকে। অন্যদিকে যুবদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য ১৯৭৮ সালে *যুব উন্নয়ন মন্ত্রণালয়* সৃষ্টি হয় এবং ১৯৮১ সালে *যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর* কার্যক্রম শুরু করে। পরবর্তীতে ১৯৮৪ সালে *যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়* প্রতিষ্ঠিত হয়।[৪৫] এই অধিদপ্তরের ভিশন: *বাংলাদেশের উন্নয়ন ও গৌরব বৃদ্ধিতে সক্ষম, নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন আধুনিক জীবনমনস্ক যুবসমাজ*। তাদের মিশন: *জীবনের সর্বক্ষেত্রে যুবদের প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তাদের প্রতিভার বিকাশ ও ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা*। দেশের সকল জেলায় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কার্যালয়ে অনাবাসিক প্রশিক্ষণ সুবিধাসহ ৬৪টি আবাসিক যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ১টি কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র এবং ৪টি আঞ্চলিক মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র রয়েছে। এক্ষেত্রে অভীষ্ট প্রশিক্ষণার্থী হচ্ছেন ১৮-৩৫ বছর বয়সী বেকার যুবক, যুবনারী (অনগ্রসর যুবনারীদের অগ্রাধিকার), শারীরিক প্রতিবন্ধী/অটিস্টিক যুবক ও যুবনারী, যুব সংগঠনের সদস্যবৃন্দ এবং ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর আওতাভুক্ত যুবক ও যুবনারী। এছাড়া দলিত, অটিস্টিক, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী যুবদের জন্য ৫ ভাগ কোটা এবং ভর্তি ফি ছাড়ের ব্যবস্থা আছে। এই অধিদপ্তরের উদ্দেশ্যঃ

- যুবদের ন্যায়নিষ্ঠ, আধুনিক জীবনবোধসম্পন্ন, আত্মমর্যাদাশীল ও ইতিবাচক মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা
- যুবদের অন্তর্নিহিত সম্ভাবনা বিকাশের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা

- যুবদের মানবসম্পদের পরিণত করা
- যুবদের মানসম্পন্ন শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা
- যুবদের যোগ্যতা অনুযায়ী পেশা ও কর্মের ব্যবস্থা করা
- যুবদের অর্থনৈতিক ও সৃজনশীল কর্মোদ্যোগ ক্ষমতায়নে উৎসাহিত করা
- ক্ষমতায়নের মাধ্যমে যুবদের জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে সক্রিয় ভূমিকা পালনে সক্ষম করে তোলা
- স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় যুবদের সম্পৃক্ত করা
- পরিবেশ সংরক্ষণ, জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ মোকাবেলাসহ জাতি গঠনমূলক কার্যক্রমে স্বেচ্ছাসেবী হতে যুবদের উৎসাহিত করা
- সমাজের অনগ্রসর এবং শারীরিক-মানসিক বা অন্য যে কোন প্রতিবন্ধকতার শিকার মানুষের প্রতি যুবসমাজকে সংবেদনশীল ও দায়িত্বশীল করে তোলা
- বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন যুবদের অধিকার নিশ্চিত করা
- জীবনাচরণে মতাদর্শগত উগ্রতা ও আক্রমণাত্মক মনোভাব পরিহারে যুবদের উদ্বুদ্ধ করা
- যুবদের মধ্যে উদার, অসাম্প্রদায়িক, মানবিক ও বৈশ্বিক চেতনা জাগ্রত করা

এসব উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য এই অধিদপ্তর দেশব্যাপী যেসব কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে সেগুলো হচ্ছে:

- যুবদের দেশ-বিদেশে কর্মসংস্থান উপযোগী করে গড়ে তোলার জন্য দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান
- প্রশিক্ষিত যুবদের ঋণ সহায়তা কার্যক্রম
- আত্মকর্মী যুবদের উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে আর্থিক এবং কারিগরি সহায়তা প্রদান
- দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কর্মকান্ডে যুবদের স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণের লক্ষ্যে যুব সংগঠন নিবন্ধন

- যুবদেরকে দায়িত্বশীল, আত্মবিশ্বাসী ও মানবিক গুণাবলী অর্জনে উৎসাহ প্রদানে কর্মসূচী গ্রহণ
- ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন অনুশীলনে অধিদপ্তরের কার্যক্রমে উদ্ভাবন, সেবা সহজিকরণ এবং সেবা ডিজিটাইজকরণ
- সফল আত্মকর্মী ও যুব সংগঠকদের কাজের স্বীকৃতি প্রদান এবং অন্যান্য যুবদের অণুপ্রাণিত করার লক্ষ্যে জাতীয় যুব পুরস্কার প্রদান
- প্রান্তিক ও যুব-জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ

এসব কার্যক্রমের আওতায় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক জেলা পর্যায়ে ৪১টি ট্রেডের প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা হয়। ২০২২-২৩ অর্থবছরে এরকম প্রশিক্ষণ প্রদান করার লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৬৮,৭৮০ জন। এছাড়া ২ লাখ ৪ হাজার ৯ শত যুবককে ৪২টি ট্রেডের অপ্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ প্রদানের পরিকল্পনা ছিল। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে প্রাণিসম্পদ, মৎস্য, কৃষি, বস্ত্র, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স। এছাড়া পদ্মা সেতু নির্মাণে জমি অধিগ্রহণের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের জীবিকা উন্নয়নেও ১২টি ট্রেডের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে (বেসিক কম্পিউটার, ফ্রিজ ও এসি মেরামত, ওয়েল্ডিং, ইলেকট্রিশিয়ান, পাটজাত পণ্য উৎপাদন, টেইলারিং, ক্রাফটিং, বাটিক, মোবাইল ও টিভি মেরামত, ক্ষুদ্র ব্যবসা, গরু ও ছাগল পালন)। এর পাশাপাশি বেসিক কম্পিউটার এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অ্যাপ্লিকেশন, গ্রাফিক্স ডিজাইন, কমিউনিকেটিভ ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ, পোশাক তৈরি, ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিক্স, রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ারকন্ডিশনিং এবং সমন্বিত কৃষি বিষয়ক ভিডিও কনটেন্ট প্রস্তুত করে অনলাইনে আপলোড করার কাজ চলছে। তথ্যে ডিজিটাল প্রবেশাধিকারের প্রসারে গৃহিত সরকারি উদ্যোগ *এক্সেস টু ইনফর্মেশন* (*এটুআই*) এর সহযোগিতায় অনলাইন *মুক্তপাঠে* কোয়েল পালন, গরু মোটাতাজাকরণ, ভার্মিকম্পোস্ট, স্ক্রিন প্রিন্টিং, মিশ্র মাছ চাষ এবং বিজ্ঞানসম্মত পশুর চামড়া ছাড়ানো ও সংরক্ষণ বিষিয়ক ভিডিও কনটেন্ট আপলোড করা হয়েছে। সার্বিকভাবে ২০২২ সালের জুন মাস পর্যন্ত ৬৭,৬৫,০৪৯ জন যুব এই অধিদপ্তর থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন এবং ২৩,৩২,৪৪১ জনের আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে। এছাড়া ২০১১ সাল থেকে ০১ নভেম্বর তারিখে *যুব দিবস* উদযাপন এবং যুবদের উৎসাহিত করতে *জাতীয় যুব*

পুরস্কার প্রদান করা হচ্ছে। এর পাশাপাশি বিভিন্ন এনজিও যুবদের সাথে সচেতনতা ও দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। আন্তর্জাতিক পরিসরে *জাতিসংঘ* ২০০০ সাল থেকে ১২ আগস্ট সারা বিশ্বে *আন্তর্জাতিক যুবদিবস* উদযাপন করে।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ২০২১-২২ অর্থবছরে প্রায় ৪৪ হাজার যুবককে আত্মকর্মসংস্থান, পরিবারভিত্তিক ও যুব উদ্যোক্তা ঋণ কর্মসূচীর আওতায় প্রায় ১৫০ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করেছে। এই অধিদপ্তরের ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন বাজেট ছিল যথাক্রমে ৫৩.৫৮ কোটি টাকা ও ৪৪০.৬৮ কোটি টাকা। *যুব সংগঠন (নিবন্ধন এবং পরিচালনা) ২০১৫* অনুযায়ী ২০২২ সালের জুন মাস পর্যন্ত ২,৮২৩ টি যুব সংগঠনকে স্বীকৃতি এবং ৩,২৭৩ টিকে নিবন্ধন দেওয়া হয়েছে। এছাড়া এই আইন অনুযায়ী *জাতীয় যুব কাউন্সিল* গঠনের বাধ্যবাধকতা তৈরি হয়েছে।

এখানে মূলত দুটো প্রধান ধারার কার্যক্রম দেখা যাচ্ছে। একদিকে আছে আধুনিক প্রযুক্তি তথা চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সাথে সম্পর্কিত কম্পিউটার, ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্স, ফ্রিজ-টিভি-এসি-মোবাইল-গ্রাফিক্স ডিজাইন ও ইংরেজী ভাষার দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম। অন্যদিকে আছে সমন্বিত কৃষি, গবাদিপশুপাখি পালন, মাছ চাষ, পাটজাত পণ্য ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা বিষয়ক কৃষিজ ও কুটির শিল্প বিষয়ক প্রশিক্ষণের মত বিষয়। এই কৃষিজ ধারার মধ্যে আবার দুই ধরনের ইস্যু দেখা যাচ্ছে। প্রথমত, শিল্পায়িত কৃষি উপকরণ নির্ভর ফসল আবাদ ও গবাদিপশুপাখি পালন। এখানে শিল্পায়িত কৃষি উপকরণ বলতে কারখানায় উৎপাদিত কৃত্রিম রাসায়নিক সার, বালাইনাশক বিষ, হরমোন, অ্যান্টিবায়োটিক, গবাদিপশু-পাখি-মাছের খাদ্য, কোম্পানির হাইব্রিড ও জিএমও বীজ, সিমেন, রেনু-পোনা, কোম্পানির প্যাটেন্ট করা জিন ও জাত, নানা যন্ত্রপাতি, প্রযুক্তি ইত্যাদি বিষয়াদিকে বোঝানো হয়েছে। এসব প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যুবরা একদিকে কৃষি ও পরিবেশের প্রাথমিক বিষয়াদি জানতে পারে, অন্যদিকে অধিক উৎপাদন ও মুনাফার জন্য তারা শিল্পায়িত কৃষি উপকরণ ব্যবহারে উৎসাহী ও অভ্যস্ত হয়ে উঠে। আর কৃষিজ বিষয়াদির দ্বিতীয় ধারায় আছে বাঁশ-বেত-চামড়া-পাটজাত পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, নকশীকাঁথা, হস্তশিল্প, ঔষধি গাছ, কম্পোস্ট সার ও কুটির শিল্প বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মসূচী। এসব ক্ষেত্রে স্থানীয় ও টেকসই জীবন যাপনের কিছু উপাদানের ছোঁয়া দেখা যায়।

ইউরোপে ১৭৮৪ সালে বাষ্পীয় ইঞ্জিন আবিস্কারের মাধ্যমে প্রথম শিল্পবিপ্লব হয়েছিল এবং উৎপাদনের যান্ত্রিকীকরণ ঘটে। ১৮৭০ সালে বিদ্যুৎ আবিষ্কার হলে নতুন যুগের সূচনা হয় এবং উৎপাদনে বৈদ্যুতিক শক্তির ব্যাপক ব্যবহার শুরু হয়। এর প্রায় একশো বছর পর ১৯৬৯ সালে ইন্টারনেট আবিষ্কার বা তৃতীয় শিল্পবিপ্লবের মাধ্যমে উৎপাদনকে স্বয়ংক্রিয় করতে ইলেকট্রনিকস ও তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার শুরু হয়। সম্প্রতি এর ব্যাপক বর্ধিত ডিজিটাল সংস্করন হিসাবে চতুর্থ শিল্পবিপ্লব শুরু হয়েছে। এটি বিভিন্ন প্রযুক্তির সমন্বয় বা ফিউশন। এর মাধ্যমে মানুষের দৈনন্দিন যোগাযোগ ও কার্যক্রমের ডিজিটাল রূপান্তর ও আমূল পরিবর্তন ঘটানো হবে। এজন্য সবকিছু ইন্টারনেটের মাধ্যমে সংযুক্ত স্মার্ট যন্ত্রের সংযোগের আওতায় আনা হবে। ইন্টারনেট, মোবাইল নেটওয়ার্ক ও ডিজিটাল ডিভাইসের মাধ্যমে যেকোন যন্ত্র, টুলস, ইলেকট্রনিক ও মেকানিকাল সরঞ্জাম একে অপরের সাথে মিথস্ক্রিয়া করবে। এগুলোর সাথে সংযুক্ত বিগ ডাটা বা বিশাল তথ্যভান্ডারের তথ্য গণনা ও বিশ্লেষণ করে যন্ত্র নিজেই সিদ্ধান্ত নিতে পারবে। স্বল্প দক্ষ শ্রমিক, একই কাজ বারবার করা শ্রমিক, ক্যাশিয়ার, ট্রাক বা গাড়িচালক, কল সেন্টার, ঝুঁকিপূর্ণ বা বিপজ্জনক কাজ, নির্মাণ শ্রমিক, নিরাপত্তা প্রহরী অথবা গৃহস্থালির কাজ ইত্যাদি ক্ষেত্রে মানব শ্রমিক রোবট দ্বারা প্রতিস্থাপিত করা হবে। এসব যন্ত্র তৈরি ও পরিচালনার কারিগরি খাতে অতি দক্ষ ও দক্ষ কর্মসংস্থান বাড়বে। সব মিলিয়ে নানা উদীয়মান প্রযুক্তির সাথে পঞ্চম প্রজন্মের টেলিকম প্রযুক্তি যুক্ত হয়ে ফিউশন প্রযুক্তির বিকাশ ঘটানো হবে। নিচে ফয়েজ আহমদ তৈয়্যবের লেখা থেকে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের কয়েকটি কারিগরি প্রযুক্তি, সম্ভবনা এবং আশঙ্কার ক্ষেত্রগুলো তুলে ধরা হল।[৪৬] এর মূল প্রযুক্তিগুলো হচ্ছে:

- চতুর্থ বা পঞ্চম প্রজন্মের (4G/5G) টেলিকম
- স্মার্টফোন ও ডিভাইসকেন্দ্রিক তথ্যপ্রযুক্তি
- ইন্টারনেট অব থিংস (আইওটি বা যেকোন জিনিসেই সিমকার্ড ও চিপ রেখে দূরনিয়ন্ত্রণ)
- কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ভার্চুয়াল রিয়েলিটি, ডেটা মাইনিং, মেশিন লার্নিং
- যন্ত্রপাতি পরিচালনায় ও ব্যবসায়িক সিদ্ধান্তে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার
- রোবোটিকস ও দূরনিয়ন্ত্রণ

- কৃষি, আবহাওয়া, সামরিক খাত ও নজরদারির ক্ষেত্রে ড্রোন ব্যবহার
- জৈবপ্রযুক্তি, জিন টেকনোলজি, প্রাণের ক্লোন
- সুপার কম্পিউটার বা ক্লাউড কম্পিউটিং
- ফিনটেক বা ফাইনান্সিয়াল টেকনোলজি
- ব্লক চেইন ও ডিজিটাল কারেন্সি
- ম্যাসিভ কানেকটিভিটি
- চালক ছাড়া পরিবহন

এছাড়া চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের ফলে মানবসমাজের সম্ভবনা বা ইতিবাচক দিকগুলো হচ্ছে:

- মানুষের কাজ ও আয়ের ক্ষেত্র বাড়বে
- বৈশ্বিক পণ্য সরবরাহ প্রক্রিয়া বদলে যাবে
- শিপমেন্ট সহজ ও সাশ্রয়ী হওয়ার ফলে পণ্য ও সেবার খরচ কমবে ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের আরও প্রসার হবে
- সরকারি সেবা সাধারণ মানুষের নাগালে আসবে এবং সরকার পরিচালনা ও নীতিনির্ধারণে বড় পরিবর্তন আসবে
- জীবনযাপন সহজ হবে এবং ভোগ-বিলাস আরও নাগালে আসবে।

আর চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের আশঙ্কা বা ঝুঁকিগুলো হচ্ছে:

- অসমতা ও দারিদ্র্যতা আরও অসহনীয় হতে পারে
- বিশ্বে আগের তুলনায় সম্পদ বৈষম্য বাড়তে পারে
- নতুন প্রযুক্তি আয়ত্তকারী কোম্পানি অন্যান্য কোম্পানিকে বাজার থেকে সরিয়ে দিতে পারে
- বহু ক্ষুদ্র ও মাঝারি কোম্পানি দেউলিয়া হয়ে যেতে পারে
- রোবট ও যন্ত্রপাতি দিয়ে মানুষের অনেক কাজ সম্পন্ন করায় শ্রমবাজারে অদক্ষ ও স্বল্প দক্ষ শ্রমিকদের চাহিদা কমে আসবে, যার প্রধান ভুক্তভোগী হবে উন্নয়নশী দেশগুলো
- ডিজিটাল প্রযুক্তি ও স্মার্ট ডিভাইসের আবিষ্কারক ও বিনিয়োগকারী দেশগুলো অধিক লাভবান হবে। এর বিপরীতে অন্যান্য দেশ ও কোম্পানি বঞ্চিত হবে।

- সব ধরনের ব্যবসা বড় কোম্পানির আওতায় চলে যাবে
- প্রতিষ্ঠানগুলোকে টিকে থাকার জহন্য প্রযুক্তি ব্যবহারে সর্বোচ্চ দক্ষতা অর্জন করতে হবে
- মারণাস্ত্রের সহজলভ্যতা সন্ত্রাসবাদ ও নিরাপত্তাঝুঁকি তৈরি করবে
- রোবটিক যুদ্ধের সূচনা হতে পারে।

চতুর্থ শিল্পবিপ্লবে বাংলাদেশের প্রস্তুতি হিসাবে সরকারিভাবে প্রথমে *ডিজিটাল* ও পরবর্তীতে *স্মার্ট* বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় নেওয়া হয়। এছাড়া *এক্সেস টু ইনফর্মেশন*সহ বঙ্গবন্ধু সাটেলাইট-১, বঙ্গবন্ধু ডিজিটাল বিশ্ববিদ্যালয়, শেখ হাসিনা সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বিষয়ক জাতীয় কৌশলপত্র, কারিগরি শিক্ষার সম্প্রসারণ, তথ্যপ্রযুক্তি পণ্য রপ্তানির কাঠামো তৈরি, ২০৩০ সালের মধ্যে কারিগরি শিক্ষার্থীদের হার ৩০ ভাগ করার লক্ষ্য নির্ধারণ ইত্যাদি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে ১৫ বছর আয়ুষ্কালের বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটের মূল কাজ টিভি সম্প্রচার, ভিস্যাট (ভয়েস, ডেটা ও ইন্টারনেট সার্ভিসযুক্ত প্রাইভেট নেটওয়ার্ক) ও ডিটিএইচ (ডিরেক্ট টু হোম)। এক্ষেত্রে বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ এবং পরিচালনা ব্যায় বাবদ দৈনিক ৫৫ লাখ টাকার বেশি খরচ হয়, অথচ আয় হয় মাত্র ৫৫ হাজার টাকা। বাংলাদেশি টিভি চ্যানেলগুলো এই স্যাটেলাইটের মাধ্যমে সম্প্রচার শুরু করার আগেই *বেক্সিমকো কমিউনিকেসন্স* তারবিহীন ডিশ সংযোগ *আকাশ ডিটিএইচ* সেবা চালু করে। কিন্তু বিশেষজ্ঞদের মতে এসব বিনিয়োগের ক্ষেত্রে কোন বিশেষ ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর স্বার্থ বিবেচনা না করা, সকল আগ্রহী বিনিয়োগকারীর প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা এবং বিনিয়োগের অগ্রাধিকার ক্ষেত্র বিবেচনা করা জরুরী বিষয়।[৪৭]

বাংলাদেশের যুবরা তথ্যপ্রযুক্তিগত দিক থেকে কোন অবস্থানে আছে তা বোঝার জন্য নিচের উদাহরণ কাজে দিবে। *শেখ হাসিনা সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্কের* ১০ হাজার ফ্রিল্যান্সারের বিজ্ঞাপনের বিপরীতে ৩৩ হাজার গ্র্যাজুয়েট আবেদন করেছিলেন। কিন্তু মৌখিক ও ব্যবহারিক পরীক্ষায় মাত্র ১৭ জন নির্বাচিত হন। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার অবস্থাও এর মাধ্যমে বোঝা যায়। জাতিসংঘের হিসাবেও বাংলাদেশে ১৫-২৪ বছর বয়সীদের ৮৫ ভাগের ডিজিটাল দক্ষতার ঘাটতি আছে। প্রতিবেশী দেশের মধ্যে ভুটান (৬৮.৫%), শ্রীলঙ্কা (৭০.৬%), ইন্ডিয়া (৭৩.১%) এক্ষেত্রে

এগিয়ে আছে। অন্যদিকে নেপাল (৮৭.৪%) ও পাকিস্তান (৮৪.৫%) পিছিয়ে আছে।[৪৮]

১৭ কোটি জনসংখ্যা অধ্যুষিত বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ বাজার। এই বাজারের অন্যতম অংশীদার ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা বা *এসএমই* (শর্ট এন্ড মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজ)। এখানে প্রায় ৭৯ লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থান হয়। এর মধ্যে ৬৬ লাখ মানুষ কর্মরত আছে ক্ষুদ্র এন্টারপ্রাইজে, ৭ লাখ মানুষ মাঝারি এন্টারপ্রাইজে এবং ৫.৫ লাখ মানুষ অতিক্ষুদ্র বা মাইক্রো এন্টারপ্রাইজের সাথে সংশ্লিষ্ট।[৪৯] কিন্তু এই বিপুল সংখ্যক উদ্যোগ বা এন্টারপ্রাইজে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি গ্রহণের হার খুবই কম। সার্বিকভাবে বাংলাদেশের বাণিজ্য খাতে ডিজিটাল প্রযুক্তি গ্রহণের মান ১ এর মধ্যে মাত্র ০.৩৫। কিছু ক্ষেত্রে আর্থিক হিসাবের জন্য *মাইক্রোসফট এক্সেল* এবং অর্ডার ব্যবস্থাপনার জন্য ই-কমার্স সাইট ব্যবহার করা হয়। কিন্তু ব্যবসার পরিধি বাড়ার সাথে সাথে এগুলোর সীমাবদ্ধতা ধরা পড়ে। যানবাহন ও মানুষ ট্র্যাকিং, সম্পদ ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যারসহ নানা কিছু ব্যবহার প্রয়োজন হয় এখানে। সর্বোপরি ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের ব্যবসার পরিধি বৃদ্ধি, অর্থ ব্যবস্থাপনা এবং ডিজিটাল মার্কেটিং এর তাগিদে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি গ্রহণ করতে হয়। তবে এক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক প্রাথমিক জ্ঞানের ঘাটতি, অদক্ষ শ্রমিক, বিদ্যায়তন ও শিল্প কারখানার মধ্যে সমন্বয়ের অভাব, স্থানীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সেব প্রদানকারীদের উপর অনাস্থা প্রভৃতি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি গ্রহণে প্রধান বাধা হিসাবে কাজ করে। ফলে চতুর্থ শিল্পবিপ্লব সংশ্লিষ্ট ক্লাউড কম্পিউটিং, স্থান চিহ্নিতকরণ প্রযুক্তি, বিশাল তথ্য ভান্ডার বা বিগ ডাটা বিশ্লেষণ প্রভৃতি প্রযুক্তি ব্যবহারের হার কম। সেবা খাতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার তুলনামূলক বেশি। এছাড়া বড় বা নেতৃস্থানীয় বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলো এগুলোর সবই ব্যবহার করে। কিন্তু এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আইনসমূহের বাস্তবায়ন এবং সরকারি কার্যক্রমের ঘাটতি রয়েছে। তবে সরকার এক্সেস টু ইনফরমেশন, ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও ব্যবসা বিষয়ক নানা ডিজিটাল প্লাটফরম এবং সরকারি ক্রয়, কর প্রভৃতি বিষয় অনলাইনে সম্পাদনের উদ্যোগ নিয়েছে। এছাড়া বেসরকারি উদ্যোক্তারা ওয়েবসাইট পরিচালনা, ডিজিটাল মার্কেটিং এবং কাস্টমাইজড অ্যাপ নিয়ে বাজারে নেমেছে।[৫০] ২০১৮ সালে দেশে

তথ্যপ্রযুক্তি সেবা খাতের বাজার ছিল প্রায় ১০ হাজার কোটি টাকার, আর রপ্তানি ৮.৫ হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেছে। দেশে প্রায় ১,৫০০ আইটি ও আইটিএস কোম্পানি রয়েছে।[৫১]

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে নানা স্থানীয় উদ্যোগও দেশে ডানা মেলেছে। ডালের বড়ি, সিদল, গুড়, মধু, আম, স্থানীয় ধানের চালসহ নানা নিরাপদ ও রাসায়নিক খাদ্য পণ্য ও রান্না করা খাদ্যের অনলাইন বাজার ক্রমে বড় হচ্ছে। তবে বড় কোম্পানিগুলো বিজ্ঞাপন বাবদ বিপুল অর্থ খরচ করে এসব অনলাইন প্লাটফরমেও প্রভাব ফেলে। অন্যদিকে মাইক্রোসফট অফিসসহ বিভিন্ন সফটওয়্যার ব্যবহারের যে খরচ তা যোগান দেওয়া ছোট উদ্যোক্তাদের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হিসাবে দেখা দিচ্ছে। হয়তো প্রসারের স্বার্থে এসব সফটওয়্যারের কপিরাইট আরোপের ক্ষেত্রে এখন পর্যন্ত কিছুটা শিথিলতা রয়েছে। তবে এগুলোর উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল হয়ে গেলে নিশ্চিতভাবে কপিরাইট আইন শক্তভাবে প্রয়োগ করা হবে এবং ব্যবহারকারীদের এসব সফটওয়্যার বা এপ ব্যবহারের ফি বা খরচ পরিশোধ করতে হবে। এর পাশাপাশি পর্নোগ্রাফি ও অনলাইন গেমসের বাড়বাড়ন্ত সমাজকে আচ্ছন্ন করে ফেলছে। খেলাধুলার নির্মল আনন্দ অনলাইন জুয়ার কালিমায় ঢাকা পড়ে যাচ্ছে। দেশের শিশুদের মোবাইল আসক্তিও এখন অভিভাবকদের অন্যতম চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। পিতামাতার নাগরিক ব্যস্ততা এবং খেলার মাঠের স্বল্পতার সুযোগে বিভিন্ন ডিভাইস হয়ে উঠছে শিশু-কিশোর-যুবদের নিত্যসঙ্গী। মোবাইল ফোন কোম্পানিগুলো তাদের ব্যবসার প্রসারের স্বার্থে একসময় বিনা পয়সায় সারা রাত মোবাইলে কথা বলার সুযোগ দিয়েছিল। সেই ধারাবাহিকতাও এখনও তরুণ প্রজন্ম গভীর রাত পর্যন্ত সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অবস্থান করছে। এগুলোর মাধ্যমে তরুণ প্রজন্ম ও যুবসমাজ এমন জগতে প্রবেশ করে যেগুলো পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠদের কাছে অচেনা। ফলে পারিবারিক ও সামাজিক নানা সংকটও দেখা দিচ্ছে। এছাড়া ওয়াইফাই ও মোবাইল নেটওয়ার্কের জনস্বাস্থ্যগত ও পরিবেশগত প্রভাব নিয়েও তেমন মাথা ঘামানো হয় না। স্মার্টফোন ও স্মার্ট ডিভাইসে সারাক্ষণ বিনোদন, একটার পর একটা ঘটনা, অবিরাম তথ্যধারন- যুবসমাজসহ সকলকে ব্যতিব্যস্ত করে রাখছে। এসব পণ্যের প্রসারের জন্য বিজ্ঞাপনে মডেল হিসেবে সফল

অভিনেতা, খেলোয়াড় ও জনপ্রিয় ব্যক্তিত্বদের ব্যবহার করা হয়। এসব দেখে জনসাধারণও উদ্বুদ্ধ হচ্ছে নতুন নতুন প্রযুক্তি গ্রহণ করতে।

এসব প্রযুক্তির প্রসারের ফলে ইন্টারনেটের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে যে সংযোগ তৈরি হয়েছে সেটাকে কিভাবে অর্থমূল্যে পরিণত করা যায় সে ব্যাপারে কোম্পানিগুলো ক্রমাগত কাজ করে যাচ্ছে। মানুষের চাহিদা, কাজ, অবস্থান, ইচ্ছা, অনিচ্ছা, ব্যক্তিগত জীবনের খুঁটিনাটি ইত্যাদি সবকিছু গোপনে নজরদারি ও বিক্রি করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে ই-কমার্স কোম্পানিগুলো কেনাকাটায় মানুষের আগ্রহ ও অনাগ্রহের কারণগুলো বুঝতে পারে এবং বিক্রয়ের নতুন পথ ও পণ্য খুঁজে পায়। এডওয়ার্ড স্নোডেন একে নজরদারি পুঁজিবাদ হিসেবে অভিহিত করেছেন। যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা বিভাগের এই সাবেক সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ার তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির নানা অর্ন্তনিহিত বিষয় তার আত্মজীবনীতে তুলে ধরেছেন। সেখান থেকে জানা যায় কিভাবে দেশে দেশে সার্বজনীন নজরদারি চালু হয়েছে, যা নাগরিক স্বাধীনতাকে মারাত্মকভাবে লঙ্ঘন করে। এসব গণনজরদারিকে বলা হয় জরুরি তথ্য সংগ্রহ। এর মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের সরকার জনগণের গোপনীয়তা রক্ষার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে। অথচ এটি মানুষের মৌলিক অধিকার হিসেবে বিবেচিত। কিন্তু এগুলো ব্যবহার করে কর্তৃত্ববাদী অপশাসন কায়েম করা হচ্ছে। যখন মানুষ ক্লাউডে বা অনলাইনে তথ্য বা ডাটা (ছবি, ভিডিও, অডিও, লেখা ইত্যাদি) সংরক্ষণ করে, তখন মূলত এর স্বত্ব ত্যাগ করে দেওয়া হয়। এর পাশাপাশি কম্পিউটারে মানুষের প্রতিটি ক্লিক, ওয়েবসাইট ব্রাউজিং, ইমেইল, ই-কমার্স সাইট, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমসহ স্মার্ট ফোন, টিভি, ফ্রিজ, সিসি ক্যামেরা ইত্যাদি নিত্য ব্যবহার্য জিনিস থেকেও গ্রাহকের এবং তার ঘরের ভেতরের তথ্য সংগ্রহ করা হয়। তখন কোম্পানিগুলো সিদ্ধান্ত নিতে পারে যে, কোন তথ্য রাখা হবে আর কোনটা বাদ দেওয়া হবে। কোম্পানি যদি কোন তথ্য আপত্তিকর বা ক্ষতিকর মনে করে তাহলে তারা নিজেদের কাছে কপি রেখে মানুষের ডাটা একতরফাভাবে মুছেও দিতে পারে। এমনকি এই তথ্য মানুষকে না জানিয়ে কর্তৃপক্ষের কাছে তুলে দিতে পারে অথবা অন্য কোম্পানির কাছে বিক্রি করে দিতে পারে। অথচ মানুষ নিজেই আঙুলের ছাপ, চেহারা, কণ্ঠস্বর ইত্যাদি বাণিজ্যিক নজরদারির হাতে তুলে দিচ্ছে। কিন্তু এসব তথ্যের গোপনীয়তা নির্ভর করে তথ্যের মালিকানার উপর। প্রযুক্তির উপর

জনসাধারণের এই নির্ভরতাকে পুঁজি করে কোম্পানিগুলো মুনাফা অর্জন করছে, আর সরকার নিজের প্রয়োজনে এগুলো ব্যবহার করছে।[৫২]

কর্মসংস্থানের জন্য যে বিপুল পরিমাণ মানুষ পরিবার ছেড়ে দূরের শহরে বা বিদেশে থাকেন তাদের যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম মোবাইল ফোন। এসব ইলেকট্রনিক পণ্যের প্রসারের ফলে বাংলাদেশের মানুষ বছরে প্রায় ৩০ লাখ টন ইলেকট্রনিক-বর্জ্য তৈরি করে। এর পরিমাণ প্রতি বছর ৩০ শতাংশ হারে বাড়ছে এবং ২০২৫ সাল নাগাদ বাংলাদেশ ১ কোটি টনের ই-বর্জ্যের ভাগাড়ে পরিণত হবে।[৫৩] এই যে প্রতি সেকেন্ডে ৯৫ কেজি হিসেবে দৈনিক ৮২ লাখ কেজি ই-বর্জ্য তৈরি হচ্ছে, এর প্রধান ভুক্তভোগী কারা হবে? এই বিশাল বর্জ্য জমতে থাকলে তা নিঃস্বন্দেহে যুবদের জন্য বিশাল বোঝা হিসাবে আবির্ভূত হবে। যেমন করে পূর্ববতী প্রজন্মের শিল্পবিপ্লবের খেসারত হিসাবে, বর্তমান প্রজন্মগুলোকে জলবায়ু পরিবর্তনের ভয়ঙ্কর অভিঘাত এবং এ সংশ্লিষ্ট নানা রকম বিপন্নতা পোহাতে হচ্ছে।

অন্যান্য প্রাণের মত প্রতিটি মানুষ জন্মগত কিছু অধিকার নিয়ে পৃথিবীতে আসে। আর প্রকৃতির আলো-বাতাস-জল-খাদ্য গ্রহণের ফলে মানুষের কিছু দায় তৈরি হয়। এই দায় থেকে আসে পরিবেশ ও প্রতিবেশীদের প্রতি দায়িত্ববোধ। তবে এই দায়িত্ববোধের সাথে পরিবেশের সাথে সম্পর্ক ও অধিকারের প্রশ্ন জড়িত। বাংলাদেশের মানুষ নিজেদের স্বাধীন ভূখন্ডের প্রাকৃতিক সম্পদে প্রতিটি মানুষের সুষম অধিকার নিশ্চিত করতে পারেনি। কার্যকর ভূমি সংস্কারের অভাবে দেশের মাত্র ১৬ ভাগ পরিবারের মালিকানায় অর্ধেকের বেশি কৃষিজমি কুক্ষিগত হয়ে আছে। ব্রিটিশ আমলে গ্রামে জমির মালিকানা পাওয়ার বদৌলতে জমিদার-জোতদার-বণিকদের পরবর্তী প্রজন্ম শহরে শাসক ও বিত্তশালী গোষ্ঠীর অংশে পরিণত হয়েছিল। ব্রিটিশদের পূর্ববর্তী শাসকরা ভারতীয় উপমহাদেশ আক্রমণ করতে এসে এ অঞ্চলেই থিতু হয়েছিল। কিন্তু ব্রিটিশদের লক্ষ্য ছিল ভিন্ন। এ অঞ্চলের সম্পদ ইংল্যান্ডে পাঠানো এবং এখানকার গ্রামীণ কুটির শিল্প ও স্বনির্ভর অর্থনীতি ধ্বংস করে ব্রিটিশ ব্যবসায়ীদের পণ্য প্রচলনের জন্য কিছু নিবেদিতপ্রাণ কর্মী তাদের প্রয়োজন ছিল। এখানকার জমিদার-জোতদার-মহাজন-বণিক-কর্মচারীদের অনেকেই ব্রিটেনে পুঁজি পাচারের এই পরিকাঠামো সচল রাখতে সহায়তা করেছেন। বিনিময়ে নিজেরাও লাভবান

হয়েছেন। আর জনসংখ্যার একটা বড় অংশের বিপন্নতা ক্রমে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশ্বযুদ্ধ ও দেশভাগের পর পশ্চিমা উন্নয়ন কার্যক্রম ও পরবর্তীতে মুক্ত বাজার অর্থনীতির সুবিধাগুলোও বিত্তশালী গোষ্ঠী বেশি পেয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে বর্তমানে ডিজিটাল বিভাজন বা বৈষম্য কিভাবে প্রশমিত করা যাবে সেটা মানব সমাজের একটা বড় প্রশ্ন।



ছবি ঃ যুবসমাজের অনেকটা সময় কেটে যায় স্মার্টফোনের সাথে

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং জেন্ডার

২০৩০ সালের মধ্যে *টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট* বা *এসডিজি* (*সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল*) পূরণ, বিশেষ করে জেন্ডার সমতা এবং নারী ও শিশুদের ক্ষমতায়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। নারীর ক্ষমতায়নে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার এসডিজির ৫ নম্বর অভিষ্টের অন্যতম উদ্দেশ্য। তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নারীর ক্ষমতায়ন তথা নিজের মতামত প্রকাশে সাহায্য করে। এটি নারীদের সমাজে ভাল অবস্থান তৈরি করতে এবং পছন্দসই পেশায় কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করে। এছাড়া তথ্যপ্রযুক্তি শুধু অভিষ্ট ৫ অর্জন করতেই সাহায্য করে না, বরং এটি অন্যান্য অভিষ্ট অর্জনেও সক্রিয় ভূমিকা পালন করে।[৫৪]

১৯৯৫ সালে বেইজিংয়ে অনুষ্ঠিত চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে জেন্ডার সমতা প্রথম আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পায়।[৫৫] এই সম্মেলনে 'নারী ও মিডিয়া'কে সামাজিক বৈষম্য দূরীকরণে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে তুলে ধরা হয়।[৫৬] পরবর্তীতে ১৯৯৮ সালে মাল্টায় *আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়নের* বিশ্ব টেলিযোগাযোগ উন্নয়ন সম্মেলন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক কর্মসূচী এবং নীতিতে জেন্ডার সমতার বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।[৫৭] এই সম্মেলনে সরকারি ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসহ অন্যান্য অংশীজনের কর্মসূচীতে জেন্ডার সমতার বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।

এক্ষেত্রে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হচ্ছে ১৯৯৮ সালে অনুষ্ঠিত আফ্রিকার অর্থনৈতিক কমিশনের *নারী ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্মেলন*। সেখানে জেন্ডার এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে আলোচনার অন্যতম প্রধান বিষয় হিসাবে নির্ধারণ করা হয়েছিল।[৫৮] এই সম্মেলন এবং উন্নয়ন অংশীজনদের প্রাসঙ্গিক আলোচনা ২০০৩ সালে জেনেভায় অনুষ্ঠিত *বিশ্ব তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং সমাজ* শীর্ষক শীর্ষ সম্মেলনের এজেন্ডায় অন্তর্ভুক্ত করতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে। এখানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে নারীর ক্ষমতায়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ টুল বা হাতিয়ার হিসাবে উপস্থাপন করা হয়।[৫৯] এরপর থেকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে জেন্ডার

বৈষম্য হ্রাস, নারীর ক্ষমতায়ন এবং উন্নয়নের একটি অত্যাবশকীয় উপাদান হিসাবে বিবেচনা করা হচ্ছে।[৬০]

নারী-পুরুষের সমতা অর্জন এবং নারীর ক্ষমতায়ন বাংলাদেশের অন্যতম দুটি জাতীয় লক্ষ্য। এই লক্ষ্য দুটি প্রতিফলিত হয়েছে দেশের সর্বোচ্চ দলিল জাতীয় সংবিধানে এবং বিভিন্ন স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনায়। জেন্ডার সম্পর্কিত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সনদ অনুমোদন করেও বাংলাদেশ এই লক্ষ্য দুটির প্রতি তার গুরুত্বের প্রতিফলন ঘটিয়েছে। অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের মত বাংলাদেশের নারীরাও পারিবারিক ও সামাজিক অগ্রগতিতে কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে। তবে বিভিন্ন শ্রেণির নারীরা অর্থনৈতিক পরিসরে প্রায়ই অদৃশ্য থাকেন। নিরক্ষতা, আত্মবিশ্বাস ও গতিশীলতার ঘাটতির কারণেও নারীরা প্রায়ই মুল আলোচনা থেকে বাদ পড়ে যায়। তাই কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জনে বিগত কয়েক বছর ধরে জাতীয় বাজেটে যেমন প্রত্যক্ষ বরাদ্দ রাখা শুরু হয়েছে, তেমনি নারী-পুরুষ সমতা এবং নারীর ক্ষমতায়নকে আমলে নিয়েই বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে কর্মকাণ্ড পরিচালনাকে গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) খানা আয় ও ব্যয় জরিপ ২০২২-এ অনুযায়ী বাংলাদেশ দারিদ্র্যের হার ১৮ দশমিক ৭ শতাংশ।[৬১] বাংলাদেশে জনসংখ্যার ৪৯.৫ শতাংশ নারী।[৬২] কিন্তু সম্পত্তি ও আনুষ্ঠানিক কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে তারা পুরুষদের চেয়ে অনগ্রসর অবস্থানে আছেন।[৬৩] বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশের মতো বাংলাদেশেও দারিদ্র্যের অন্যতম কারণ জেন্ডার বৈষম্য, শিক্ষার নিম্ন মান, বেকারত্ব, আয় বৈষম্য, বাণিজ্য ব্যর্থতা, দুর্বল পরিকাঠামো, রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং পরিবেশগত অবক্ষয়।[৬৪] মোবাইল ফোন, কম্পিউটার, ইন্টারনেট ইত্যাদির সহায়তায় বাংলাদেশের গ্রামীণ নারীদের ক্ষমতায়িত করা গেলে দারিদ্র্যতা হ্রাস পাবে এবং সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং অন্যান্য পর্যায়ে উন্নয়ন সম্ভব হবে বলে মনে করা হয়।[৬৫] অর্থাৎ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নারীদের ক্ষমতায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।[৬৬] এটি তাদের অর্থনৈতিক কার্যক্রমে সমান অংশীদার হওয়ার সুযোগ করে দেয়। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি তাদের উৎপাদনশীলতা বাড়াতে এবং কর্মজীবনে এগিয়ে যেতে সহায়তা করে। এছাড়া নারীরা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে পরিবার-

পরিচিতজন এবং ব্যবসার গ্রাহক ও সরবরাহকারীদের সাথে সাথে যোগাযোগ করতে পারে, তাদের মতামত প্রকাশ করতে পারে এবং বিভিন্ন সামাজিক আন্দোলনে যুক্ত হতে পারে। এটি তাদের সামাজিকভাবে ক্ষমতায়িত হতে সহায়তা করে। এছাড়া অনলাইনে শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি, ফ্রিল্যান্সিং এবং ব্যবসা শুরু করতে সহায়ক হয়। সামগ্রিকভাবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অন্যদের পাশাপাশি নারীদেরও শিক্ষা, কর্মসংস্থান, যোগাযোগ এবং সামাজিক ক্ষমতায়ন অর্জনে সহায়তা করে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নারীদের জন্য যোগাযোগ স্থাপন ও বজায় রাখার ক্ষেত্রে একটি সুলভ উপায় হতে পারে।[৬৭]

বিশ্বব্যাপী উন্নয়নের জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অন্যতম মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত। আর্থসামাজিক উন্নয়নে পুরুষের তুলনায় নারীর জন্য তথ্য প্রযুক্তি বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এমনকি অনলাইনে নারী ও মেয়েদের উপস্থিতি দ্বিগুণ হলে তা উন্নয়শীল দেশগুলোর জিডিপি ১৩-১৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বৃদ্ধি করতে পারে। ইনটেলের সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে, প্রায় অর্ধেক নারী চাকরি খোঁজার জন্য ইন্টারনেট ব্যবহার করেন এবং প্রায় ৩০ ভাগ নারী ইন্টারনেট ব্যবহারকারী অনলাইনে অতিরিক্ত উপার্জন করছেন।[৬৮] এটা ঠিক যে ইতোমধ্যে বাংলাদেশের নারীরা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ খাতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে, কিন্তু সমতা অর্জনের ক্ষেত্রে তারা এখনও অনেক প্রতিকূলতার সম্মুখীন হচ্ছেন। উল্লেখ্য *বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের* বৈশ্বিক জেন্ডার সমতা প্রতিবেদন ২০২৩-এ বাংলাদেশের অবস্থান ৫৯তম।[৬৯]

বাংলাদেশে নারীরা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার থেকে উপকৃত হওয়ার ক্ষেত্রে যেসব চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছেন তার মধ্যে রয়েছে: শিক্ষাগত যোগ্যতার ঘাটতি, সীমিত গতিশীলতা, সীমিত আয় এবং অন্যান্য সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বাধা। ২০২২ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বাংলাদেশে নারীদের সাক্ষরতার হার ৬২.৫ ভাগ, যা পুরুষদের ক্ষেত্রে ৭৫.১ ভাগ।[৭০] এর ফলে নারীরা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জনে পিছিয়ে থাকেন। এছাড়া পুরুষদের তুলনায় নারীদের প্রযুক্তি ব্যবহার করার সুযোগ ও কার্যকারিতা কম, যা তাদের অধিকার এবং জেন্ডার সমতাকে প্রভাবিত করে।[৭১] বাংলাদেশের জাতীয়

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতি অনুসারে, সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি শিক্ষা চালু করা, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে শিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচী প্রদান করা, ভার্চুয়াল তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি শিক্ষক নিয়োগ করা, ওয়েব-ভিত্তিক কোর্সওয়ার্ক তৈরি করা এবং একটি রপ্তানিমুখী সফটওয়্যার শিল্পের বৃদ্ধিকে উৎসাহিত করার জন্য একাধিক পদক্ষেপের রূপরেখা দেওয়া হয়েছে। এই নীতিতে দেশব্যাপী ডাকঘর এবং স্থানীয় সরকার কেন্দ্রগুলিতে সাইবার কেন্দ্র স্থাপনের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে যাতে সকলের ইন্টারনেট প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা যায়। তবে এই নীতিতে কোথাও জেন্ডার-ভিত্তিক বিবেচনার কথা উল্লেখ করা হয়নি।

এছাড়া তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে নারীদের যেসব বাধা রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে সম্পদ, তথ্য এবং সহায়ক কাঠামোতেনিয়ন্ত্রিত প্রবেশাধিকার। পরিবার ও সন্তান লালন সংক্রান্ত কার্যক্রমে পুরুষদের তুলনায় নারীদের বেশি সময় দিতে হয়। এছাড়া নারীরা সাধারণত পুরুষদের তুলনায় প্রশিক্ষণ বা সম্পদে প্রবেশাধিকারের ক্ষেত্রে বেশি বাধার সম্মুখীন হয়। কিন্তু তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি-সংক্রান্ত কর্মসংস্থানে যুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে ডিজিটাল সাক্ষরতা বা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক দক্ষতা বৃদ্ধি নারীদের সহায়তা করতে পারে। ২০২২ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বাংলাদেশে নারীদের গড় মাসিক আয় ৮,০০০ টাকা, যা পুরুষদের গড় মাসিক আয়ের তুলনায় ৩০ ভাগ কম।[৭২] এর ফলে নারীরা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি-ভিত্তিক সরঞ্জাম এবং পরিসেবাগুলিতে বিনিয়োগ করতে তুলনামূলক কম সক্ষম। এর পাশাপাশি বাংলাদেশে নারীদের নানা ধরনের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিকূলতা রয়েছে, যা তাদের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় অনেক পরিবার মনে করে যে নারীদের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করা উচিত নয়, কারণ এটি তাদের নৈতিকতার জন্য ক্ষতিকারক। তবে ১৯৯৭ সালে দুঃস্থ নারীদের আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের উদ্দেশ্যে চালু হওয়া পল্লী ফোনের গ্রাহক ১৬ লাখ ছাড়িয়ে গেছে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে জেন্ডার ও উন্নয়ন বিষয়টি নারী অধিকার এবং জেন্ডার ন্যায়বিচারের দৃষ্টিকোণ থেকেও আলোচনা করা হয়।[৭৩] বাংলাদেশে

ইন্টারনেট চালু হয় ১৯৯৬ সালে।[৭৪] কিন্তু নারীরা পুরুষের তুলনায় গড়ে ২৫ শতাংশ কম তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে। একই অবস্থা দেখা যায় দক্ষিণ এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য এবং আফ্রিকাতে। এই ডিজিটাল বিভাজন তৈরি হয় প্রাপ্যতা, প্রবেশাধিকার, ব্যয়ভার বহন করার ক্ষমতা এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহারের উপর ভিত্তিতে। বর্তমানে বিশ্বের মাত্র ১৫ শতাংশ মানুষ ব্রডব্যান্ড সেবার ব্যয়ভার বহন করতে পারে। এটি অনেকাংশে টেলিকমিউনিকেশন কাঠামোর সাথে সম্পর্কিত। বিশেষত গ্রামীন জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে এটি বিশেষভাবে প্রযোজ্য। এমনকি যেসব এলাকায় নেটওয়ার্ক আছে, সেখানেও ইন্টারনেটের খরচ যোগানো অনেক ব্যবহারকারীদের জন্য কঠিন হয়ে যায়। বিশেষ করে প্রান্তিক এলাকার নারী ও বয়স্ক মানুষ এজন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করতে পারেন না। ইনটেলের *ওমেন অ্যান্ড ওয়েব*-এ বলা হয়েছে, *বর্তমানে যারা অনলাইনে আছেন বা যারা নেই, উভয়ের জন্যই ইন্টারনেট ক্রয়ক্ষমতা একটি বড় বাধা। জেন্ডার সংশ্লিষ্ট নানা ধরনের বাঁধার পাশাপাশি নারীরা মূলত অর্থনৈতিক বাঁধার শিকার বেশি হন*। এছাড়া উন্নয়নশীল দেশগুলোতে উন্নত দেশগুলোর তুলনায় ইন্টারনেট নেটওয়ার্কের আওতা অনেক কম।[৭৫]

২০০০ সালে বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার মাত্র ০.১% মাত্র ইন্টারনেট ব্যবহার করত। ২০১৬ সালে এই হার ছিল ১৩.২ ভাগ।[৭৬] ২০২৩ সালে যা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৩৮.৯%, যা সংখ্যার হিসাবে প্রায় ৬ কোটি ৭০ লাখ।এছাড়া দেশের ৮৯.৯ ভাগ মানুষ মোবাইল ফোন এবং এর মধ্যে ৩০.৯ ভাগ মানুষ স্মার্টফোন ব্যবহার করে। অন্যদিকে প্রায় ৩১ হাজার বসতবাড়ি এবং ১,১২,৬০০ জনের উপর সম্পাদিত জরিপে দেখা গেছে ৫২.২ ভাগ পরিবারে মোবাইল ফোন আছে। এর মধ্যে ৭.৪ ভাগ মানুষ কম্পিউটার ব্যবহার করে, ৬১.৮ ভাগ মানুষের নিজস্ব মোবাইল ফোন রয়েছে এবং মাত্র ১.৪ ভাগ প্রোগ্রামিং বা কোডিং জানেন। বিগত ১০ বছরে দেশে মোবাইল ফোন ব্যবহারের হার ৮.২ ভাগ এবং কম্পিউটার ব্যবহারের হার ১.৮ ভাগ বেড়েছে।[৭৭] যদিও এক্ষেত্রে উপজেলা পর্যায়ে চিত্র অন্য রকম।

সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর উপজেলায় সংশ্লিষ্টদের সাথে কথা বলে জানা যায়, ইন্টারনেট এর ব্যবহার যুবদের জীবনকে নানাভাবে প্রভাবিত করছে। তাদের দৈনন্দিন কার্যাবলী এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে ইন্টারনেট ব্যবহারের সুফল

ভোগ করতে পারবেন বলে তারা মনে করেন। তবে উপজেলা পর্যায়ে যুবদের কম্পিউটারে প্রবেশাধিকার বেশ কম। সেখানে গ্রাম পর্যায়ে বাসাবাড়িতে কম্পিউটারের ব্যবহার তেমন নেই। তবে তরুণ প্রজন্ম স্মার্ট ফোনে ইন্টারনেট ব্যবহার করেন। এক্ষেত্রে ইন্টারনেট এর উচ্চমূল্য এবং নেটওয়ার্ক সমস্যাকে তারা বড় বাধা বলে মনে করেন। এছাড়া ইন্টারনেট ব্যবহার করে মোবাইল ব্যাংকিং ব্যবহারকারীর হারও বেশ কম। স্থানীয় গ্রামীণ যুবদের কাছে সরকারি-বেসরকারি প্রশিক্ষণ বা প্রতিযোগিতার খবর তেমন পৌছায় না। এসব কর্মসূচী মূলত বিভাগ বা জেলাভিত্তিক হয়ে থাকে। সর্বোপরি স্বল্প শিক্ষাগত যোগ্যতা ও আয় এবং নানা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বাধার কারণে অনেক মানুষ এখনও ইন্টারনেট ব্যবহার করেন না। তবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি, কর্মসংস্থান, অভিবাসন, বাস-ট্রেনের টিকেট ক্রয়, কোভিড-১৯ এর ভ্যাকসিন গ্রহণের জন্য নিবন্ধন, পাসপোর্ট এবং আয়করসহ বিভিন্ন সরকারি সেবার ডিজিটাইলেজশনের কারনে উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে 'কম্পিউটারের দোকান' চালু হয়েছে। এসব দোকানে যেয়ে ডিজিটাল সেবা থেকে বঞ্চিত জনগোষ্ঠী অর্থের বিনিময়ে প্রয়োজনীয় কাজ সারতে পারেন।

এছাড়া ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, বর্তমানে তথ্য এবং যোগাযোগ প্রযুক্তির ফলে নারীরা বিভিন্ন কর্মসংস্থানের সুযোগ পাচ্ছে। একটা সময় নারীদেরকে কেবল ঘরের কাজের জন্য বিবেচনা করা হত এবং উন্নয়নের মূলধারার বাইরে রাখা হত। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির আবির্ভাবের সাথে সাথে নারীদের সম্পর্কে এই রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গির কিছু পরিবর্তন হয়েছে। এমনকি যাদের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক দক্ষতা নেই, যারা নিরক্ষর বা গতিশীলতার অভাব রয়েছে, তারাও এসব ব্যবহার করে নানা ধরনের আয়মূলক কাজে যুক্ত হচ্ছেন। এছাড়া তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা হিসাবে আত্মপ্রকাশের সুযোগও তৈরি হচ্ছে। দেশে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে নারী উদ্যোক্তার সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। নারী উদ্যোক্তারা নানা রকম ই-কমার্স ও ডিজিটাল মার্কেটিং ব্যবসার সাথে যুক্ত হচ্ছেন। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম *ফেইসবুক* এর নারী উদ্যোক্তা গ্রুপ *এফ-কমার্স* বা উই-তে ৪ লাখের অধিক নারী সদস্য রয়েছেন। এছাড়া *ই-কমার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ* বা *ই-ক্যাব*-এর উদ্যোক্তাদের ২৭ ভাগ নারী।

নারীরা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে উপার্জন করায় পারিবারিক ও সামাজিক পরিসরে তাদের অবস্থান শক্তিশালী হয়েছে, যা অন্য নারীদেরও উদ্বুদ্ধ করছে। অর্থাৎ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি শুধু একটি প্রযুক্তি নয়, বরং নারী ক্ষমতায়নের হাতিয়ার হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। তবে নারীর সার্বিক ক্ষমতায়নের অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে রাজনীতি। এই ক্ষেত্রেও তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বিভিন্ন সামাজিক যোগযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে নারীদের অনলাইন উপস্থিতির বৃদ্ধির ফলে বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলনে তাদের অংশগ্রহণ বাড়ছে। উদাহরণস্বরূপ মিশর, বাহরাইন, সিরিয়া ও তিউনিসিয়াতে আরব বসন্ত এবং বাংলাদেশে শাহবাগ, নিরাপদ সড়ক ও গাছ রক্ষা আন্দোলনে অনলাইন ও অফলাইনে ব্যাপক সংখ্যা নারী অংশগ্রহণ করেছেন।[৭৮] জেন্ডার গবেষকরা দেখেছেন যে, এসব নতুন মাধ্যম (যেমন-সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, ওয়েবসাইট এবং মোবাইল অ্যাপস) নারীদের আর্থসামাজিক পটভূমি বিবেচনা না করেই তাদেরকে সাহায্য করে। Take back the tech এরকম একটি বৈশ্বিক ক্যাম্পেইন, যা অনলাইন অথবা মোবাইল ফোনের মাধ্যমে নারীরা যেসব সহিংসতার স্বীকার হয় তার বিরুদ্ধে সচেতনতা বৃদ্ধি করে। এশিয়া মহাদেশের প্রায় ৯টি দেশে (অস্ট্রেলিয়া, বাংলাদেশ, কম্বোডিয়া, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্তান, ফিলিপাইন ও শ্রীলঙ্কা) এই ক্যাম্পেইন চলেছে।[৭৯]

এছাড়া সরকারের স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রেও তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সহায়তা করে। অনেক ক্ষেত্রেই মানুষ সরকারি-বেসরকারি পরিসেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে হয়রানির শিকার হলে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তা তুলে ধরেন এবং এভাবে সেই ইস্যুতে জনমত গড়ে উঠে। সাতক্ষীরার শ্যামনগরের আরশাদ আলী উচ্চ বিদ্যালয় এর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিয়য়ক শিক্ষক এর সাথে কথা বলে জানা যায়, বেশ কিছু দিন আগে সেই বিদ্যালয়ের একজন ছাত্রী ডিজিটাল মাধ্যমে যৌন হয়রানির শিকার হয়েছিলেন। পরবর্তীতে শিক্ষক এবং শিক্ষাথীদের উদ্যোগে সেই ঘটনায় অপরাধীর শাস্তি হয়। এছাড়া ঐ বিদ্যালয়ে নিয়মিতভাবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের সাইবার সিকিউরিটি, পর্ণ আসক্তি এবং ডিজিটাল নিরাপত্তা বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য নানা ধরনের আলোচনা করা হয়। তাছাড়া এই বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের কম্পিউটার অথবা ল্যাপটপ

ব্যবহারে অভ্যস্ত করতে সপ্তাহে একবার শিক্ষকদের সহায়তায় ল্যাপটপ এর মাধ্যমে পাঠদান করা হয়।

নারীদেরকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে অবগত করার ক্ষেত্রে গণমাধ্যম উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। গণমাধ্যমে নানা ধরনের শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান ও প্রতিবেদন প্রচার করা হয়। এসব অনুষ্ঠান ও প্রতিবেদনের মাধ্যমে নারীরা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক দক্ষতা অর্জনের পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে পারেন। এর পাশাপাশি প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার নানা ধরনের গঠনমূলক বিজ্ঞাপন ও অনুষ্ঠানের মাধ্যমেও এ বিষয়ে নারীদের সচেতনতা বৃদ্ধি পায়।

পরিবেশ

সুজলা-সুফলা শস্য-শ্যামলা বাংলার বুক চিরে বয়ে চলেছে অসংখ্য নদী ও নদী অববাহিকা। এসব জলাধারা দিয়ে বিন্দু বিন্দু উর্বর পলি এসে গড়ে উঠেছে বিশ্বের সর্ববৃহৎ ব-দ্বীপ। ফলে এ অঞ্চল পেয়েছে নির্মল আলো-বাতাস, উর্বর মাটি, কৃষিজ, মৎস্য, জলজ ও বনজ সম্পদের অফুরন্ত সমাহার। বিভিন্ন নদীর তীরে যুগে যুগে গড়ে উঠেছে মানব বসতি, গ্রাম, বন্দর, নগর ও সংস্কৃতি। গরুর গাড়ি ও পাল তোলা নৌকার তালে ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া, জারি, সারি, মুর্শিদী, মারফতীসহ নানা ধরনের গানের সুরের ঝংকার বেজে উঠেছে এই ভূখন্ডে। খলিলুর রহমানের লেখা থেকে জানা যায়[৮০], ১৯৭০-এর গোড়ার দিকেও মাকড়সার জালের মত ছড়িয়ে ছিল অসংখ্য নদী, উপনদী, শাখা নদী, নালা, ছড়া, খাল, বিল, ঝিল, হাওড় ও বাওড়। সেসব স্রোতস্বিনী নদীর বিশাল স্রোতধারা বর্তমানে আর নেই। অথচ প্রাচীন কাল থেকে মানুষসহ এই ভূখন্ডের প্রাণবৈচিত্র্যের জীবনের উৎস ছিল নদী। দেশে প্রায় ২৩০টি নদী ও বেশ কিছু ছড়া ও নালা আছে। এর মধ্যে আন্তর্জাতিক নদী ৫৭টি, যেগুলোর মূল উৎপত্তিস্থল প্রতিবেশী ইন্ডিয়া, নেপাল, চীন, ভুটান ও মায়ানমারের পাবর্ত্য অঞ্চল।

পশ্চিম হিমালয়ের ভাগিরথী ও অলকানন্দ উপনদীর সমন্বয়ে যে স্রোতধারা বঙ্গোপসাগরের দিকে এগিয়ে গেছে ইন্ডিয়ায় তার নাম গঙ্গা। চীন-ইন্ডিয়া সীমান্ত সংলগ্ন গঙ্গোত্রী হিমবাহ থেকে ভাগিরথী এবং সিন্ধু ও ব্রহ্মপুত্র নদের উৎপত্তি স্থানের কাছাকাছি ধবল তুষার আচ্ছাদিত পর্বতশৃঙ্গ থেকে অলকানন্দ নদীর উৎপত্তি। গঙ্গা বাংলাদেশে প্রবেশ করে পদ্মা নাম ধারণ করে। দেশে এর একমাত্র উপনদী মহানন্দা, যার উৎপত্তি ইন্ডিয়া-নেপাল সীমান্তের কাছাকাছি হিমালয়ের একটি জলাধার থেকে। গঙ্গা-পদ্মার অন্যতম শাখা নদী ভৈরব, মাথাভাঙ্গা, গড়াই ইত্যাদি। ভৈরব ও মাথাভাঙ্গা নদী সংযুক্ত হয়ে কপোতাক্ষ নদের উৎপত্তি। গড়াই থেকেও দুটি শাখা নদী তৈরি হয় এবং মোল্লার হাটের কাছে এটি মধুমতি নাম ধারণ করে। মধুমতি নদী গোপালগঞ্জ, মাদারিপুর ও বরিশালের উত্তরাংশে বিশাল বিলাঞ্চল সৃষ্টি করেছিল। একসময় কলকাতা থেকে ভৈরব-মধুমতি-কালিগঙ্গা-ধানসিঁড়ি নদী ও সংলগ্ন অসংখ্য খাল দিয়ে ঝালকাঠি-বরিশালসহ অন্যান্য বাণিজ্যিক

নৌবন্দরে নৌযান চলাচল করত। বরিশাল অঞ্চলের ধান, পাট, শীতল পাটি, নারিকেল, সুপারি, আখ, কলা, পেয়ারা, পানসহ নানা ধরনের পণ্য নানা নদী বন্দরে যেত। ধানসিঁড়ি নদীর তীরে ছিল বাংলার বৃহত্তম শীতল পাটি গাছের বাগান, প্রচুর ছৈলা ও শোলা জাতীয় গাছ, রানাপাতা, হেউলিপাতা, হোগলা, শন, কাঁশফুল ও নল খাগড়া। এই অঞ্চল একসময় বালাম চাল ও রূপালী ইলিশের জন্যও ব্যাপক সমৃদ্ধ ছিল। কীর্তনখোলা, সুগন্ধা, বিশখালী, খয়রাবাদ, পায়রা, রাজগঞ্জ, বিঘা, বুড়িশ্বর, তেতুলিয়া, লোহালিয়া নদীসহ জালের মত অসংখ্য খালের মাধ্যমে বরিশাল অঞ্চল জীবনের স্পন্দন ধ্বনিত হয়েছিল। বজরা, গয়না, পানশী, বড় বড় পালতোলা নৌকা ও ব্রিটিশ স্টিমার চলত এসব খাল-নদী দিয়ে। এখানকার ডোবা-খাল-নদীতে পাওয়া যেত অঢেল বাটা, তপশে, কৈ, শিং, পোয়া, টেংরা, শোল, পাবদা, গজার, টাকী, বাতাসী, কাইন, কাজীল, চিনাপুঁটি, পুঁটি, তিতপুঁটি, সরপুঁটি, আইড়, বেলে, খলিশা, উটকল, তারা বাইম, শাল বাইম, চিংড়ি, দগড়ি, রুই, কাতলা, বোয়াল, পাংগাশ, ভ্যাদা, কোরালসহ অগণিত প্রজাতির মাছ। এসব জলাশয়ের বাসিন্দা ছিল কচ্ছপ, কাঁকড়া, শামুক, ঝিনুক, ডাহুক, কোড়া, মাছরাঙ্গা পাখি এবং সংলগ্ন বনজঙ্গলে ছিল দাস বাঘ, চিতা বাঘ, নেকড়ে বাঘ, শিয়াল ও পাতি শিয়ালের মত নানা বন্য পশুপাখি, সরিসৃপ ও কীটপতঙ্গ।

অন্যদিকে উত্তর হিমালয়ের কৈলাশ পর্বতশৃঙ্গের হিমবাহের অবিরাম ধারা থেকে উৎপত্তি ব্রহ্মপুত্র নদের। দুধকুমার, ধরলা ও তিস্তা উপনদী একে আরও বেগবান করেছে। সিকিমের ২১ হাজার ফুট উঁচু পূর্ব-মধ্য হিমালয়ের একটি বিশাল হিমবাহ থেকে নেমে আসা চো লহমু হ্রদ থেকে তিস্তা নদীর উৎপত্তি। আর দুধকুমার ও ধরলার উৎপত্তি হিমালয়ের ভুটান অংশ থেকে। ১৭৬২ সালের ভূমিকম্প, ১৭৮৭ সালে রংপুর অঞ্চলে অস্বাভাবিক বৃষ্টি এবং উজানের পাহাড়ি ঢলে এটির শাখা নদী যমুনা বা নব ব্রহ্মপুত্র পরিপুষ্ট হয়ে উঠে। আর প্রমত্তা ব্রহ্মপুত্র যমুনার একটি শাখা নদীতে পরিণত হয়। যমুনার সবচেয়ে দীর্ঘ ও প্রশস্ত উপনদী করতোয়ার উৎপত্তি জলপাইগুড়ি জেলার জলাভূমি থেকে। করতোয়া দিনাজপুরে দুই ভাগ হয়ে একদিকে আত্রাই নামে নাটোরে বড়াল নদীতে মিলিত হয়, অন্য অংশটি করতোয়া নামেই বগুড়ায় এসে বাঙ্গালী নদীতে পতিত হয়। আত্রাই, বড়াল, নন্দকুজা, গুমানী, বেশানী, ভদ্রবতী, করতোয়া প্রভৃতি নদী আবার চলনবিলের জলরাশির সাথে যুক্ত।

ব্রহ্মপুত্র-যমনুার বিশাল পানি প্রবাহ গোয়ালন্দের কাছে পদ্মায় মিলিত হয়ে আরও সামনে এগিয়ে চাঁদপুরের কাছে মেঘনায় মিশে। মিলিত এই ত্রিধারা মেঘনা নামে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়। উৎপত্তিস্থল থেকে সাগরের মোহনা পর্যন্ত ব্রহ্মপুত্রের দৈর্ঘ্য প্রায় ২,৯০০ কিলোমিটার। রাজধানী ঢাকার আশেপাশের বংশী ও তুরাগ নদীর উৎপত্তি পুরাতন ব্রহ্মপুত্র থেকে, আর ইছামতি, ধলেশ্বরী ও বানর নদীর উৎপত্তি যমুনা থেকে। বুড়িগঙ্গা ও বালু নদীর উৎস ধলেশ্বরী নদী, আর এর উপনদী শীতলক্ষ্যা।

অন্যদিকে ইন্ডিয়ার নাগাল্যান্ড রাজ্যের পাবর্ত্য অঞ্চলে উৎপত্তি হয়ে বরাক নদী সুরমা ও কুশিয়ারা দুটি ধারায় বিভক্ত হয়ে সিলেট দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করে। সুরমা বিশ্বের সর্বোচ্চ বৃষ্টিপ্রবণ অঞ্চলের পানি ধারণ করে সিলেটে প্রবেশ করে লুভা, হারি, গোয়াইগাং, পিয়াইগাং, বোগাপানি, যাদুকাটা ও অন্যান্য ছড়ার পানি গ্রহণ করে এগোতে থাকে। অন্যদিকে ত্রিপুরায় সৃষ্ট জুড়ি ও মনু নদীর সাথে মিলিত হয়ে কুশিয়ারা এগিয়ে যায় এবং সুরমার সাথে মিশে ভৈরববাজারে মেঘনা নাম ধারণ করে। এরপর চাঁদপুরে পদ্মার পানি ধারণ করে মেঘনা নদী আরও দক্ষিণে যেয়ে ভোলায় ৩টি প্রণালীতে বিভক্ত হয় সাগরে মিশে। বরাক-সুরমা-মেঘনার উৎস থেকে সাগর পর্যন্ত দৈর্ঘ্য প্রায় ১,০৪০ কিলোমিটার, যার মধ্যে বাংলাদেশে পড়েছে ৬৭০ কিলোমিটার। আর পার্বত্য চট্রগ্রাম অঞ্চলের মূহুরী ও ফেনী নদীর উৎপত্তি ইন্ডিয়ার ত্রিপুরা রাজ্যে। কর্ণফুলীর উৎস মিজোরাম রাজ্য। সাঙ্গু, নাফ ও মাতামুহুরী নদীর উৎপত্তি মায়ানমারের আরাকান রাজ্যের পাহাড় থেকে।

অর্থাৎ বাংলাদেশের প্রধান নদীগুলোর উৎপত্তি দেশের বাইরে। এজন্য এসব নদীর পানি প্রবাহ নির্ভর করছে আন্তর্জাতিক নানা বিষয়ের উপর। ইন্ডিয়া শক্তির জোরে আন্তর্জাতিক আইন ও নিয়ম-নীতি অগ্রাহ্য করে উজান থেকে প্রকৃতির অমূল্য সম্পদ পানি প্রত্যাহার করে নিচ্ছে। পবর্তশৃঙ্গ ও পাহাড়ী অঞ্চলের বরফগলা পানি প্রবাহ রোধ করে ভাটি অঞ্চলের কোটি কোটি মানুষের বেঁচে থাকার অধিকার কেড়ে নিচ্ছে এবং ব্যহত হচ্ছে প্রাকৃতিক পানিচক্র। বাংলাদেশের ৫৭টি আন্তর্জাতিক নদীর মধ্যে ৫৪টির উৎস চীন, নেপাল, ভুটান ও ইন্ডিয়ার পার্বত্য অঞ্চল, আর অন্য ৩টির উৎপত্তি মায়ানমারে। বাংলাদেশের ভৌগলিক অবস্থান ভাটি অঞ্চলে হওয়ায় উজানে যে কোন ধরনের পানি নিয়ন্ত্রণের প্রভাব এদেশের উপরই পড়ে। সেদিকে

দৃষ্টিপাত না করে চাঁপাইনবাবগঞ্জের ১৭ কিলোমিটার উজানে ১৯৬১ সালে ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণ শুরু হয়। ১৯৭৫ সালে বাঁধ চালু হওয়ার পর বাংলাদেশ ভূখন্ডের প্রায় ২০টি নদী মরে গেছে এবং প্রায় ১০০টি নদীর অবস্থা মরণাপন্ন। পানির অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কা থেকে ১৯৭৬ সালেই মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর নেতৃত্বে ফারাক্কা বাঁধ বিরোধী বিশাল লংমার্চ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু ক্রমে স্রোত না থাকায় নদীগুলো নাব্যতা হারিয়েছে অথবা নদীর বুকে জেগেছে বিস্তির্ণ চর। বিপন্ন হয়েছে দেশের কৃষি, বন, বন্যপ্রাণী, পাখি, মাছ, সরিসৃপ, জলনির্ভর জনগোষ্ঠী ও সার্বিক প্রতিবেশ-ব্যবস্থা। এর পাশাপাশি ইন্ডিয়া রাজস্থানের থর মরুভূমিসহ অন্যান্য খরাপীড়িত অঞ্চলে পানি সরবরাহের জন্য *আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প* বাস্তবায়ন করছে। এর আওতায় বাঁধ, জলাধার ও সংযোগ খালের মাধ্যমে গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্রসহ প্রায় ৩৮টি নদীর পানি প্রবাহ ইন্ডিয়ার উত্তর, উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণাঞ্চলের শুষ্ক অঞ্চলে বন্টন করে কৃষিকাজে ব্যবহার করা হবে। ব্রহ্মপুত্র অববাহিকার পানি উড়িষ্যা হয়ে অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক ও তামিলনাড়ু পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হবে। আর গঙ্গার পানি যাবে উত্তর প্রদেশ, হরিয়ানা, রাজস্থান ও গুজরাটে। উভয় দিকের প্রবাহ প্রায় ১০ হাজার কিলোমিটার ঘুরিয়ে আবার একত্রে করা হবে। এর ফলে বাংলাদেশে যেসব মারাত্মক প্রতিক্রিয়া হতে পারে সেগুলো হচ্ছে[৮১]:

- নদ-নদীর বিলুপ্তি
- বিস্তির্ণ অঞ্চলে মরুকরণ
- অকাল বন্যা ও নদী ভাঙ্গন
- লবণাক্ততা বৃদ্ধি ও সুন্দরবন বিনাশ
- কৃষি ধ্বংস
- মৎস্য ও একুয়াকালচারের বিনাশ
- পানিতে মাত্রাতিরিক্ত আর্সেনিক দূষণ
- প্রাণবৈচিত্র্য ধ্বংস ও প্রতিবেশের অবক্ষয়
- প্রাকৃতিক দূর্যোগ
- বেকারত্ব ও উদ্বাস্তু সমস্যা
- উপকূলে সাগড় ভাঙ্গন



ছবি ঃ পুনর্ভবা নদী এখন ধু ধু বালুচর

একবিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকেই বাংলাদেশের ২৩০টি নদীর মধ্যে ১৭০টির দশা করুণ হয়ে যায়। রাজশাহী, নাটোর, মানিকগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, ফরিদপুর, রাজবাড়ী, মাদারিপুর, শরিয়তপুরে পদ্মায় অসংখ্য চর সৃষ্টি হয়েছে। পদ্মার প্রধান শাখানদী গড়াইতে শুধু বর্ষা মৌসুমে কিছুটা পানি প্রবাহিত হয়। কুষ্টিয়া-ফরিদপুর-যশোর অঞ্চলের প্রমত্তা কুমার, মাথাভাঙ্গা, কপোতাক্ষ, হরিহর, নবগঙ্গা, চিত্রা, ব্যাঙ, ইছামতি, ভৈরব, কালনী, ডাকুয়া, বেতনা, মুক্তেশ্বরী, ভদ্রা, কালিন্দীসহ প্রায় সকল নদী শুষ্ক মৌসুমে নিস্প্রাণ হয়ে যায়। দক্ষিণাঞ্চলের বিখ্যাত বলেশ্বর, আড়িয়াল খাঁ, কীর্তিনাশা, ধানসিঁড়ি নদীসহ খাল-বিলের অবস্থা আশংকাজনক। উত্তরবঙ্গের তিস্তা শীর্ণ খালে পরিণত হয়েছে। এর শাখা নদী বাঙ্গালী ও ঘাঘট শুকিয়ে গেছে। সার্বিকভাবে বৃহত্তর রংপুরের ১৭টি নদী নাব্যতা হারিয়েছে। পঞ্চগড়, নীলফামারী, রংপুর, বগুড়া এবং সিরাজগঞ্জের ওপর দিয়ে প্রবাহিত প্রমত্তা করতোয়া ও পাবনার ইছামতি এখন মৃত নদী। ব্রহ্মপুত্র-যমুনার চরে বিশাল জনগোষ্ঠী বাস করছে। বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলের আদি ব্রহ্মপুত্র নদীর জল প্রায় ৫০ হাজার একর কৃষিজমির প্রয়োজনীয় সেচের পানি যোগাতো। সাম্প্রতিক সময়ে শুষ্ক মৌসুমে এই নদীতে পানিই থাকে না। এককালের

প্রমত্তা মগড়া, সোমেশ্বরী, কংশ, নরসুন্দা, বিবিয়ানা নদীর অবস্থাও মৃতপ্রায়। শুষ্ক মৌসুমে কুমিল্লার গোমতী, তিতাস ও অন্য নদীগুলো অবস্থা করুণ হয়ে যায়। সার্বিকভাবে পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র-যমুনা এবং মেঘনা এই তিনটি প্রধান নদীর প্রবাহ বাধাগ্রস্ত হওয়ায় এগুলোর সাথে সংযুক্ত নদ-নদী ও জলাধারগুলো ক্রমে শুকিয়ে যাচ্ছে। অথচ বিশেষজ্ঞদের মতে নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ না থাকলে বাংলাদেশ বাঁচবে না।[৮২]

ঢাকা-টাঙ্গাইল-গাজীপুর-মানিকগঞ্জ-নারায়ণগঞ্জ জেলার শীতলক্ষ্যা, ধলেশ্বরী, ইছামতি, বুড়িগঙ্গা, বংশী, কালিগঙ্গা, তুরাগ নদী শিল্প দূষণে বিপর্যস্ত এবং ক্রমে প্রভাবশালীদের দখলে চলে যাচ্ছে। এসব নদী দূষণের অন্যতম উৎস ঢাকা ও আশেপাশের গার্মেন্টস, কারখানা, ইটভাটা ও নগরের ময়লার ভাগাড়গুলো। বর্তমানে গার্মেন্টস খাতে ব্যবহৃত ফ্রেব্রিকের তিন ভাগের দুই ভাগ কৃত্রিম বা সিনথেটিক। এই সিনথেটিক ফেব্রিকের অর্ধেকের বেশি তৈরি করা হয় তেল-ভিত্তিক পলিস্টার থেকে। বিগত ২০ বছরে জনসংখ্যা বেড়েছে ২৫% হারে, আর টেক্সটাইলস ম্যানুফাকচারিং এর ফাইবার উৎপাদন বেড়েছে ২০০%, অর্থাৎ দ্বিগুণ হয়েছে। এভাবে চলতে থাকলে ২০৩০ সাল নাগাদ এই খাতে সম্পদ ব্যবহার ও দূষণ ৫০% বেড়ে যাবে।[৮৩] অন্যদিকে দেশে টেক্সটাইল শিল্পে কাঁচামাল থেকে ব্লিচিং, ডাইং, ফিনিশিং এবং লনডারিং করে প্রতি কেজি ফেব্রিক তৈরি করতে আধা কেজির বেশি (প্রায় ৫৮০ গ্রাম) রাসায়নিক উপকরণ প্রয়োজন হয়।[৮৪] এগুলো কাপড় উৎপাদন, ব্যবহার থেকে ফেলে দেওয়া পর্যন্ত প্রতিটি পর্যায়ে এই রাসায়নিকগুলো নির্গত হতে থাকে। এগুলোর মধ্যে থাকে পারসিসট্যান্ট অর্গানিক পলিউট্যান্টস এবং প্রায় বার হাজার রাসায়নিক উপাদান, যেগুলো পরিবেশের সাথে মিশতে না পেরে অবিকৃত অবস্থায় জনস্বাস্থ্য ও ইকোসিস্টেমকে মারাত্মক ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দেয়।[৮৫]

নদী সুরক্ষায় আন্তর্জাতিক নদী দিবসের সাথে মিল রেখে ২০১০ সাল থেকে *রিভারাইন পিপল* বাংলাদেশে সেপ্টেম্বর মাসের শেষ রবিবার *নদী দিবস* উদযাপন শুরু করে। এই সংগঠনটি নদীর সাথে মানুষের সাংসকৃতিক বিচ্ছিন্নতা কাটাতে কাজ করে, যাতে মানুষ নদীকে সমাজ ও সভ্যতার গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে বিবেচনা করে। এজন্য নদীর সাথে দৈনন্দিন যাপনের যোগসূত্র তৈরি ও নদীর অর্থনৈতিক গুরুত্ব ফিরিয়ে আনা উচিৎ বলে



ছবি ঃ শিল্পদূষণে বিপর্যস্ত ঢাকার আশেপাশের নদীগুলো

তারা মনে করে। যাই হোক পরবর্তীতে ২০১৪ সালে গঠিত হওয়া *জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন* নদী বিষয়ক সচেতনতার প্রসারে নদী দিবস পালন শুরু করে। এছাড়া নাগরিক আন্দোলনের প্রেক্ষিতে *জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন* ৩৭,৩৯৬ নদনদী দখলদারকে চিহ্নিত করে তাদের নামের তালিকা ওয়েবসাইটে প্রকাশ করেছিল। কিন্তু পরবর্তীতে আইনি মারপ্যাঁচে সেই তালিকা বাতিল করে ওয়েবসাইট থেকে মুছে ফেলা হয়। পরিবেশ আন্দোলনকর্মীদের মতে এই সিদ্ধান্ত নদনদীর ওপর স্মরণকালের সবচেয়ে বড় আঘাত। উপরন্তু তাদের মতে দেশের নদনদীর দখল ও দূষণ রোধে দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা *জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন*-এর সফলতা প্রায় শূন্যের কোটায়।[৮৬]

বাংলাদেশ ভূখন্ডে নদীগুলোর নাব্যতা হ্রাস, সীমিত পানিপ্রবাহ, সংকুচিত বিচরণক্ষেত্র, কারেন্ট জাল দিয়ে পোনা মাছ নিধন, কৃষি জমিতে কীটনাশক ও অন্যান্য বালাইনাশক বিষ প্রয়োগ ও মানুষের অসচেতনতায় মৎস্য ও জলজ সম্পদ দিন দিন ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। বিভিন্ন প্রজাতির মাছ, পাখি এবং জলজ ও স্থলজ বন্য প্রাণী ইতোমধ্যে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। প্রায় ৯১ প্রজাতির দেশি মাছ বিলুপ্তির ঝুঁকিতে রয়েছে।[৮৭] জলাশয়ের দখল নিচ্ছে নানা বিদেশী

ও আগ্রাসী প্রজাতির মাছ।[৮৮] অথচ মানব সভ্যতা গড়ে উঠার পেছনে নদীর অবদান অপরিসীম। বর্তমান ইরাক-ইরান অঞ্চলের ট্রইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর অববাহিকায় প্রায় বারো হাজার বছর আগে স্থানীয় পরিবেশ, প্রাণবৈচিত্র্য ও সংস্কৃতির উপর ভিত্তি করে কৃষির উদ্ভব হয়। কৃষি উদ্বৃত্তের উপর ভিত্তি করে খ্রিষ্টপূর্ব ৩৫০০ অব্দে মেসোপটেমিয়ায় প্রাচীনতম সভ্যতার উন্মেষ ঘটে। সমসাময়িক সময়ে অন্যান্য নদীবিধৌত সভ্যতগুলোরও বিকাশ ঘটে। চীনের হোয়াংহো ও ইয়াংসিকিয়াং নদীবিধৌত অঞ্চলের মানুষ গড়ে তোলে চৈনিক সভ্যতা। খ্রিষ্টপূর্ব ৭,০০০, অর্থাৎ প্রায় ৯,০০০ বছর আগে সিন্ধু নদের উপত্যকায় এই অঞ্চলে কৃষির উদ্ভব হয়েছিল। ক্রমে বিভিন্ন যাযাবর জনগোষ্ঠী স্থায়ী আবাস বা কৃষি-গ্রাম গড়ে তোলে। ক্রমে গ্রামীণ সংস্কৃতি থেকে নগর সভ্যতা গড়ে উঠে। সিন্ধু নদের অববাহিকার উর্বর ভূমি থেকে প্রাপ্ত কৃষি উদ্বৃত্তের ফলে বর্তমান পাকিস্তান ও ইন্ডিয়ার পশ্চিমাঞ্চলে সিন্ধু সভ্যতা গড়ে উঠে। দেবল দেব নদী সুরক্ষায় এ অঞ্চলের মানুষের বোঝাপড়া বিষয়ে লিখেছেন, *এই উপমহাদেশের সর্বত্র নদীর উৎপত্তিস্থলগুলোকে পবিত্র তীর্থ বা দেবস্থান বলে চিহ্নিত করে দিয়েছিলেন। প্রাচীন জঙ্গলের মহীরুহদের শিকড়বাকড় পাহাড়ের মাটির ত্বক ভেদ ক'রে অনেক গভীরে বহুধাবিস্তীর্ণ হয়ে থাকে। এই শিকড়বাকড়ের ঘন জাল বর্ষার জল ধ'রে রাখে সারা বছর, পাহাড়ের মাটির নিচে, অদৃশ্য এক বিপুল জলাধারে। প্রতিদিন সেই মহাজলাধার থেকে চুঁইয়ে পড়ে শত শত গ্যালন জল, ঝর্ণার রূপে। এ-জায়গার জঙ্গল নষ্ট হওয়ার অর্থ, নির্ঝরিণীগুলো শুকিয়ে যাওয়া, নদীর মৃত্যু।*[৮৯]

বাংলাদেশে প্রতিদিন প্রায় ২৭ লাখ ৫০ হাজার লিটার পানির প্রয়োজন হয়, যার ৮০ শতাংশই আসে মাটির নিচ থেকে।[৯০] আর এই পানির ৮৬-৯০ শতাংশই ব্যবহৃত হয় সেচ কাজে। ১৯৭৫ সালে ইন্ডিয়ায় ফারাক্কা বাঁধ চালু হওয়ার কয়েক বছরের মধ্যেই পদ্মা শুকিয়ে যেতে শুরু করেছিল। কিন্তু সেখানেই শেষ নয়, ইন্ডিয়া ফারাক্কা পয়েন্টের আগে আরও অন্তত ২৪টি বাঁধ ও ব্যারেজ বানিয়েছে। সবমিলিয়ে পুরো গঙ্গা বেসিনে অন্তত ৯৪২টি বাঁধ ও ব্যারেজ বানিয়ে ইন্ডিয়া পানি প্রত্যাহার করে নিয়েছে। এছাড়া মহানন্দা, পুনর্ভবা, করতোয়া, নাগরসহ অধিকাংশ আন্তঃদেশিয় নদীতেও বাঁধ দিয়েছে করেছে ইন্ডিয়া। আরও উজানে গঙ্গার উপনদীগুলোতে বাঁধ দিয়েছে নেপাল। বাংলাদেশেও বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য স্লুইসগেট বানিয়ে নদী মেরে ফেলা হয়েছে ও বিস্তীর্ণ এলাকা জলাবদ্ধতার কবলে পড়েছে। সার্বিকভাবে এক কালের প্রমত্তা

নদীগুলো প্রভাবশালী ভূমিদস্যু বা নদীখেকোদের কবলে পড়েছে। বিভিন্ন শহরের পৌরসভাও ময়লা ফেলে নদী ভরাট করে ফেলছে।

আগেই বলা হয়েছে যে একচেটিয়া বৈশ্বিক পুঁজির স্বার্থে কৃষিখাতে রাসায়নিক সার, কীটনাশক বিষ ও যান্ত্রিক সেচের উপর নির্ভরশীল সবুজ বিপ্লব মডেল চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই কৃষি ব্যবস্থা চালু রাখতে ভূগর্ভস্থ পানি তোলার জন্য শুধু রাজশাহী ও রংপুর বিভাগেই ১৬ হাজার সরকারি ও ৫৬ হাজার ব্যক্তিচালিত গভীর নলকূপ রয়েছে। এছাড়া রয়েছে অসংখ্য মিনিডিপ টিউবওয়েল। সেচ ছাড়াও স্থানীয় অটো রাইস মিলগুলোতে ডিপ টিউবওয়েল বসানো হয়েছে। অথচ রাজশাহীর বরেন্দ্র অঞ্চলে গড় বৃষ্টিপাত দেশের গড় বৃষ্টিপাতের অর্ধেক এবং সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে উচ্চতা অন্যান্য সমতলভূমির চেয়ে প্রায় ৪ গুণ উঁচু। ফলে আগে এই অঞ্চলে শুধু বর্ষা মৌসুমেই ধান চাষ হত। কিন্তু এখানকার প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য আমলে না নিয়ে সারা বছর ধান চাষের জন্য ব্যাপক হারে ভূগর্ভস্থ পানি তোলায় এবং স্থানীয় নদী শুকিয়ে যাওয়ার ফলে পানির স্তর বিগত ৩ দশকে ৬ থেকে ৮ গুণ নীচে নেমে গেছে। পরবর্তীতে বানানো পাতকুয়াতেও পানি পাওয়া যাচ্ছে না। এর সাথে আবার নানা রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ব্যাপারও জড়িত। যতটুকু পানি আছে ক্ষমতাবান ও প্রভাবশালীরা তার ভাগ পেলেও দরিদ্র্যরা তার ভাগ পায় না। ২০২২ সালে ১২ দিন ধরে স্থানীয় পাম্প অপারেটরের পেছনে ঘুরেও বোরো ধান চাষের জন্য সেচের পানি না পেয়ে গোদাগাড়ীর দুইজন সাওতাঁল কৃষক অভিনাথ মার্ডি ও রবি মার্ডি কীটনাশক পান করে আত্মহত্যা করেন। পরের বছর একই গ্রামের সাঁওতাল কৃষক মুকুল সরেন আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ায় তিনি বেঁচে যান। ৮ দিন অপেক্ষার পর পানি নিতে ডেকে নুতন পাম্প অপারেটর তাকে সারা দিন বসিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু ঐদিকে পানির অভাবে তার ধান গাছগুলো শুকিয়ে মারা যাচ্ছিল, তাই তিনি মৃত্যুকেই হয়তো মুক্তির একমাত্র পথ বলে মনে করেছিলেন।

২০১৪ সাল থেকে এখানকার কৃষকদের সেচের পানি নেওয়ার জন্য স্মার্ট কার্ড দেওয়া হয়। কৃষকরা এসব কার্ড বিএমডিএ-র অফিস বা ডিলারদের কাছ থেকে রিচার্জ করে সরকার নির্ধারিত মূল্যে প্রয়োজনীয় সেচের পানি নিতে পারেন। তবে 'আগে আসলে আগে পাবেন' ভিত্তিতে পানি দেওয়ার

সরকারি নিয়ম থাকলেও বেশি টাকা দিলে আগে পানি পাওয়া যায়। আর পানির জন্য নগদ লেনদেন আইনত নিষিদ্ধ হলেও কৃষকদের বিঘা প্রতি ১,৫০০ থেকে ৩,০০০ টাকা দিতে হয়। সাঁওতাল হওয়ার অপরাধে স্থানীয় মুসলিম কৃষকদের তুলনায় সাঁওতাল কৃষকদের পানি সরবরাহে বিলম্বের পাশাপাশি তাদের বেগার খাটিয়ে নেন স্থানীয় পাম্প অপারেটররা, যাদের অধিকাংশই আবার ক্ষমতাসীন দলের রাজনীতির সাথে জড়িত। ধনীদের জমিতে টাকার জোরে ঘন ঘন পানি দেওয়ার পাশাপাশি পাম্পের আওতার বাইরের দূরবর্তী জমিতেও নালা কেটে পানি পৌছে দেওয়া হয়। আবার ক্ষমতাসীনরা পুকুর খুঁড়ে ডিপ টিউবওয়েল দিয়ে পানি উঠিয়ে মাছচাষও করছেন। বিগত কয়েক দশকে অনিয়ন্ত্রিতভাবে ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলনের কারণে বরেন্দ্র অঞ্চলের ২১৪টি ইউনিয়নের ৩৭টিকে 'অতি উচ্চ', ৪০টিকে 'উচ্চ' এবং ৬৫টিকে 'মাঝারি পানি সংকটাপন্ন' এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। সব মিলিয়ে এ অঞ্চলের ৪০ শতাংশের বেশি ইউনিয়নে পানিশূন্যতা তৈরি হয়েছে। নলকূপগুলো অকেজো হয়ে যাওয়ায় স্থানীয় নারীদের দূর থেকে পানি আনতে হয়। এর ফলে তাদের মধ্যে পিঠের ব্যাথার প্রকোপ দেখা যাচ্ছে। আর পানি খুব হিসেব করে খরচ করায় এ অঞ্চলের নারীদের বিশেষত সাঁওতাল নারীদের ইউরিন ইনফেকশনে ভুগতে হচ্ছে।[৯১]

অন্যদিকে দেশের বৃহত্তম বিল নাটোরের চলনবিলে হাইটেক পার্ক, আইটি ট্রেনিং অ্যান্ড ইনকিউবেশন সেন্টার, টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার এবং টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ নির্মাণ করা হচ্ছে। এখানে একটি মিনি স্টেডিয়ামও তৈরির পরিকল্পনা আছে। ইতোমধ্যে হাইটেক পার্কের মাটি ভরাটের কারণে চলনবিলের একটি চ্যানেল বন্ধ হয়ে গেছে। ফলে বিস্তীর্ণ এলাকার ফসলি জমিতে দীর্ঘমেয়াদী জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়েছে।[৯২] বিশেষজ্ঞদের মতে *পানি উন্নয়ন বোর্ডের* কাজ নদী ও পানি রক্ষা করা হলেও, তারা বড় বড় প্রকল্পের মাধ্যমে নদীকে মেরে ফেলার চেষ্টা করছেন। আদালত নদীকে জীবন্ত সত্ত্বা ঘোষণা করলেও অবৈধ নদী দখলকারীদের বিরুদ্ধে কোন কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না।[৯৩]

২০২৩ সালে সাতক্ষীরার শ্যামনগরের একটি লবণাক্তপ্রবণ গ্রামেও দেখা গেছে, স্থানীয় ধনীরা বোরো ধান চাষের জন্য মটর দিয়ে খালে জমে থাকা বৃষ্টির পানি নিজেদের জমি ও পুকুরে সরিয়ে ফেলেছেন। শক্তিশালী মটর না

থাকায় স্থানীয় মুন্ডা সম্প্রদায়ের কৃষকরা এই পানির প্রতিযোগিতায় হেরে যান এবং সেচের পানির অভাবে শুধু তাদের ধান চাষ হুমকির মুখে পড়েছে তা নয়, বরং তাদের প্রাত্যহিক পানির প্রয়োজন কিভাবে মিটবে তা নিয়ে দুশ্চিন্তায় দিনাতিপাত করছেন।





ছবি ঃ উপকূলীয় অঞ্চলে লবণাক্ততার প্রভাবে ফসলহানি বাড়ছে, সেই সাথে বাড়ছে পানি সংকট

১৯৭০ সালে ঢাকা শহরে মাটির ২০ ফুট নিচেই পানি পাওয়া যেত, যা ২০২৩ সালে ২৪০ ফুট নিচে নেমে গেছে। ঢাকার আশেপাশের নদী ও জলাশয়ের পানি দূষণ ও দখলের কারণে ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়ায় *ঢাকাওয়াসা*রাজধানীতে পানি সরবরাহের জন্য দৈনিক ৩৩ লাখ ঘনমিটার ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলন করে। এতে প্রতি বছর পানির স্তর ৭ ফুট করে নিচে নেমে যাচ্ছে।[৯৪] অন্য শহরগুলোও ঢাকাকে প্রশ্নহীনভাবে অনুসরণ করছে। অন্যান্য এলাকার মধ্যে নেত্রকোনায় পানির স্তর ৩৫০ ফিট, সুনামগঞ্জের হাওরাঞ্চলে ৫০০ ফিট এবং সাতক্ষীরায় ৭০০ ফিট নিচে নেমে গেছে। অন্যদিকে আধুনিক জাতের ধানের প্রসারে হারিয়ে গেছে খরাসহিষ্ণু, বন্যাসহিষ্ণু, লবণসহিষ্ণু ও অন্যান্য গুণাগুনসমৃদ্ধ স্থানীয় ধানের হাজার হাজার জাত। এর পাশাপাশি বিলুপ্তির মুখে তিল, তিসি, কাউন, যব, ঢেমসি, বিভিন্ন ধরনের ডাল-তেলসহ বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী ফসল এবং এসব ফসলের অজস্র স্থানীয় জাত। স্থানীয় প্রতিবেশ উপযোগী এসব ফসল ও শ্যমলিমার জায়গা দখল করেছে রাসায়নিক উপকরণ নির্ভর উচ্চফলনশীল ধান, হাইব্রিড শাকসবজি, ভূট্টা, কাজী পেয়ারা, কলা, আনারস এবং ড্রাগন ফল ও মাল্টার মত গুটিকয়েক বিদেশি ফল ও ইউক্যালিপ্টাস, মেহগনি, আকাশমণির মত কিছু কাষ্ঠল গাছ। বিস্তির্ণ এলাকায় চাষ হচ্ছে একই জাতের ফসল। এতে কৃষি-প্রাণবৈচিত্র্যের অবক্ষয়ের ফলে সরল হয়ে পড়েছে চাষের ক্ষেত ও গ্রামের ইকোসিস্টেম। আর জাতবৈচিত্র্য কমে যাওয়ায় প্রাকৃতিক দূর্যোগ ও রোগ-পোকার আক্রমণে ফসলহানির শঙ্কা বাড়ছে। ক্রমাগত ঘাসমারা বিষের ব্যবহারে চাষের ক্ষেতে বা আশেপাশে যেসব অচাষকৃত শাক-লতা-পাতা-ছাতু পাওয়া যেত সেগুলোও দুর্লভ হয়ে গেছে। অথচ এসব উদ্ভিদ ও ছত্রাক আপদকালীন ও পুষ্টিকর খাদ্য হিসেবে সমাদৃত ছিল। এছাড়া নানা রোগের পথ্য হিসেবে এগুলো লোকচিকিৎসার গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কিন্তু কৃষির একাডেমিক পরিসরে শিল্পায়িত বা কর্পোরেট কৃষির যে আধিপত্য সেক্ষেত্রে একটা বদ্ধমূল ধারণা হয়েছে যে সার বা রাসায়নিক কৃষি উপকরণ ছাড়া চাষাবাদই করা যায় না। ফলে বাড়তে থাকে সার-বিষ প্রয়োগ, খাদ্যচক্র বিষাক্রান্ত হয়ে পড়ে, বিনাশ হতে থাকে প্রাণবৈচিত্র্য, আর দেশের জনপদগুলো আচ্ছন্ন হতে থাকে নানা অসংক্রামক রোগের মহামারীতে।

অথচ এ অঞ্চলের প্রাচীন গ্রন্থগুলোতে প্রায় দুই হাজার বছর আগেই গাছপালার প্রাণ হিসাবে সূর্য্যকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।হিন্দু ধর্মগ্রন্থ *বেদ-*

এ সূর্যকে পৃথিবীর আত্মা হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে এবং প্রাচীন কৃষি প্রযুক্তি সম্বন্ধে বিষদ আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থ *শতপথ*[৯৫], *সূর্য উপনিষদ*, *মৈত্রী উপনিষদ*, *কঠ উপনিষদ*, *ঈষ উপনিষদ* প্রভৃতিতে সূর্য্য, গাছপালার বৈচিত্র্য ও পরিবেশ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।[৯৬] খনার বচন ও গ্রামীণ গীতিকাব্যের মাধ্যমে কৃষি ও পরিবেশ বিষংক বিবিধ জ্ঞান হাজার বছরের অধিক সময় ধরে মানুষের মুখে মুখে টিকে থেকেছে।

প্রকৃতিতে বায়ু শোধনকারী ও দূষণ নিয়ন্ত্রক হিসাবে নানা ধরনের গাছপালা বিরাজ করে। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে অর্জুন, কাঞ্চন, তেঁতুল, নীম, শেওড়া, পলাশ, মান্দার, সোনালু, সেগুন, করম, পিয়াল, তেন্দু, মান্দার, বেল, আমলকি, মহুয়া ইত্যাদি।[৯৭] এই গাছগুলোর মধ্যে কিছু আবার বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর জন্য পবিত্র উদ্ভিদ। বহু যুগের অভিজ্ঞতা থেকে প্রাগিতিহাসের মানুষরা বট, অশ্বত্থ, বেল, শেওড়া, করম, ভর্ণা ইত্যাদি গাছকে পবিত্র হিসাবে মর্যাদা দিয়েছিল। কারণ এসব উদ্ভিদ না থাকলে বনে অন্য উদ্ভিদের বিস্তার বা পোকা-মাকড়, পশুপাখি ও সরিসৃপ কমে যায়। এর পাশাপাশি ইকোসিস্টেমের সংহতি রক্ষাকারী পেঁচা, ময়ূর, সাপ, ইঁদুর ইত্যাদি টোটেমগুলো বিভিন্ন পূরাণে দেবদেবীর বাহন হিসাবে পবিত্র করে দেয়া হয়।[৯৮]

কিন্তু সে সব দিন গেছে, এখন বনায়ন বলতে সারি সারি ইউক্যালিপ্টাস গাছ লাগানো বুঝায়। এসব গাছের সাথে স্থানীয় প্রাণবৈচিত্র্যের কোন সম্পর্ক নেই। এ প্রসঙ্গে দেবল দেব লিখেছেন, *অরণ্য বলতে যে অজস্র মহীরুহ-বীরুৎ-লতা-গুল্মের জটিল সমাহার, যারা অসংখ্য পাখি-পশু-পতঙ্গদের বাসস্থান, সেটা বাঙ্গালী আমজনতার উপলব্ধিতে আসে না, কারণ তারা সারি সারি ইউক্যালিপ্টাস আর আকাশমণির বাগিচাগুলোকেই বন ব'লে জেনেছেন। বাংলার বনের যত গাছপালা ছিল, তাদেরকে সুষ্ঠু পরিকল্পনামাফিক নিকেশ ক'রে, বাংলার নিজস্ব বৃক্ষ-বীরুৎ-লতাদের অপসারণ করে, সারে সারে রোপণ করা ইউক্যালিপ্টাসের বাগিচাকে 'বন' ব'লে প্রচার করে বন দপ্তর, আর সেই প্রচারে অবগাহন ক'রে, সেটাকেই 'বন' ব'লে গ্রহণ ক'রে নিয়েছেন আমাদের সাহিত্যপ্রেমীরা, সাহিত্যিকরা, এমনকি অনেক প্রকৃতিপ্রেমীও। .. স্থানীয় পরিবেশ যে এর ফলে কতটা বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে, সেটা তাঁরা জানেন না। সুতরাং শিশুদেরকেও জানাতে পারেন না। তাঁদের অনেকের ধারণায়, চারটে বটা গাছ বা শাল গাছ কেটে যে ক্ষতি হয়, চার-পাঁচটা ইউক্যালিপ্টাস আর আকাশমণি লাগালেই সেই*

ক্ষতি পূরণ হয়ে যাবে। .. তাঁরা খেয়াল করেন না, এই বনে.. নেই কোন পাখি, পশু, প্রজাপতিদের বৈচিত্র্য। তাঁরা টের পান না, এই ইউক্যালিপ্টাসের দল নিঃশব্দে হরণ ক'রে চলেছে বাংলার ভূজলের ভান্ডার, নিঃস্ব করে তুলছে বাংলার বনভূমির প্রাচীন মৃত্তিকাকে, অপসারণ করে দিচ্ছে নিজস্ব তরুলতাকে।[৯৯]



ছবি ঃ সারি সারি ইউক্যালিপ্টাস গাছ উত্তরবঙ্গের সবচেয়ে পরিচিত দৃশ্যপট

পৃথিবীতে একমাত্র কোয়ালা নামের প্রাণী ইউক্যালিপ্টাস গাছের পাতা খেয়ে হজম করতে পারে, কারণ এটি লাখ লাখ বছর ধরে ইউক্যালিপ্টাসের সাথে বিবর্তিত হয়েছে। কিন্তু এ অঞ্চলে কোয়ালা নেই। এছাড়া এর ঝরা পাতা পচানোর মত অণুজীব বা ছত্রাক অস্ট্রেলিয়ার বাইরে বিবর্তিত হয়নি। এজন্য বাংলাদেশে বহু বছর পরেও এই পাতা পচে না। বরং এর শিকড় ও পাতায় থাকা রাসায়নিক অন্য উদ্ভিদের বৃদ্ধি মারাত্মক ব্যহত করে। ইউক্যালিপ্টাসের রাসায়নিক প্রভাবে মাটির উপকারী জীবাণুরা মারা যায়, ফলে কেঁচোরাও এলাকা ছেড়ে চলে যায় এবং মাটির স্বাভাবিক পুষ্টিচক্র

ব্যহত হয়। এই গাছের শিকড় মাটির উপরের স্তরে পাঁচ মিটার এবং ভূগর্ভের নয় মিটার গভীর পর্যন্ত চলে যায় এবং ব্যাপক পানি শোষণ করে। এর পাশাপাশি এর পাতায় পাঁচ ধরনের জৈব এসিড থাকে, যা মাটির অম্লতা বাড়িয়ে দেয়।[১০০] কিন্তু এই গাছের দরুন জিডিপি বাড়ছে, তাই দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির স্বার্থে বাড়ছে ইউক্যালিপ্টাস লাগানো।

এরকম নানা কার্যক্রমের ফলে বাংলাদেশে প্রাকৃতিক বন বলে আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। এই প্রসঙ্গে ইনাম আল হক লেখা থেকে জানা যায়, বিগত চার দশকে পাহাড়ি অঞ্চলে টিকে থাকা বনগুলোও বিনাশ হয়েছে। পাহাড়ে চা, কফি, তামাক, রাবার, সেগুন, অ্যাকাশিয়া, সেগুন, কমলা ইত্যাদি গৃহপালিত উদ্ভিদ চাষের প্রসারের ফলে প্রাকৃতিক গাছ লোপাট হয়েছে। অর্থনীতির কাছে পরাজিত হয়েছে চিরহরিৎ। কিন্তু গাছের ছাউনি না থাকায় অনেক পাহাড়ি ঝরনা দ্রুত শুকিয়ে যাচ্ছে। পাহাড়ি জনপদে শীতকালে আগে পানির সংকট হত না। ছায়াতরু-হীন ঝরনাগুলো এখন শীতকালে শুকিয়ে যায়। হাজার হাজার ঝিরি বা ঝরনায় তখন পানি থাকত। কফিনে শেষ পেরেক হিসেবে শালবন আর অন্যান্য নিবিড় অরণ্যে গড়ে উঠছে পিকনিক স্পট, রিসোর্ট আর বিনোদন কেন্দ্র। সাউন্ডবক্সের উদ্দাম শব্দ আর অবাধে প্লাস্টিক ফেলে বিপর্যস্ত করে ফেলা হচ্ছে হাজার বছর ধরে গড়ে উঠা নিটোল ইকোসিস্টেমগুলো। বন্যপ্রাণীর আবাসস্থলে মানুষের বাহাদুরি প্রমাণ করতে কোন আয়োজনই বাদ রাখা হচ্ছে না। কিন্তু এগুলোর একটা কাজও নির্মল পরিবেশের জন্য সহায়ক নয়।[১০১]

শুধু তাই নয়, সমতলের নল, হোগলা ও ঘাসের জমিগুলোও মানুষ লোপাট করেছে। এতে নল ও ঘাসে যারা বাস বাঁধে তারাও উৎখাত হয়েছে। ইনাম আল হক আরও জানাচ্ছেন, এভাবে বাংলাদেশে বিগত ৩০ বছরে ৩০ প্রজাতির পাখি বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এই ভূখন্ডের স্থায়ী বাসিন্দা ৩৩০ প্রজাতির পাখির এক-তৃতীয়াংশ দ্রুত বিলুপ্তির পথে এগিয়ে যাচ্ছে। তবে লোকালয়ে মানুষের সাথে খাপ খাইয়ে নিয়েছে এরকম ৩০ প্রজাতির পাখির অবস্থা মোটামুটি ভাল। কিন্তু বক, বটেরা, বালিহাঁস, ডাহুক, কোড়া, ঘুঘু, হরিয়াল, প্যাঁচা, শকুন ইত্যাদি অতি-চেনা পাখিও গ্রাম থেকে দ্রুত হারিয়ে যাচ্ছে। অথচ প্রকৃতিতে যারা টিকে থাকে তারা নিজেদের মত করে নানা ভাবে প্রকৃতির সেবা করে। যেমন শকুনের পেটে মৃতদেহের রোগ-জীবাণু

পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যায়। আবার ঈগল দূর্বল ও রুগ্ন প্রাণীদের অপসারণ করে। অর্থাৎ একটি পাখি বা অন্য কোন প্রাণী বা উদ্ভিদ বিলুপ্ত হলে প্রকৃতি সেই সেবা থেকে বঞ্চিত হয়। কারণ ঈগলের কাজ শকুন করতে পারবে না, আবার শকুনের কাজ ঈগলকে দিয়ে হবে না। ফলে বাড়ছে নানা জীবাণুঘটিত রোগব্যাধীর শঙ্কা। কিন্তু নির্বিচারে ব্যাথানাশক ঔষুধ ডাইক্লোফেন ব্যবহারের ফলে দেশের শকুন প্রায় শেষ। প্রাণজগত নিয়ে মানুষের জানাবোঝা কত কম। অথচ প্রকৃতিতে ক্রমাগত বিভিন্ন বহিরাগত প্রজাতির প্রাণের অনুপ্রবেশ ঘটানো হচ্ছে। শস্য ও ফল চাষ, মাছ চাষ, গবাদিপশুপাখি পালন, সৌন্দর্যবর্ধন, বনায়ন- প্রতিটি ক্ষেত্রেই স্থানীয় পরিবেশের সাথে সম্পর্কহীন নানা বিদেশী আগ্রাসী প্রজাতির সমাবেশ ঘটানো হচ্ছে। এর পাশাপাশি মানুষের লক্ষ্য দেশের সব জলাশয়ে মাছ চাষ করা, সব ভূমিতে ফসল আবাদ করা অথবা সব মাটি কংক্রিট দিয়ে ঢেকে দিয়ে নগর তৈরি করা।[১০২]

এরকম শুধু মানুষকেন্দ্রীক চিন্তার ফলে উপকূলে জাল ও জেলের সংখ্যাও বেড়ে চলেছে। বিল-বাদা, হাওড়-বাঁওড়, ছন-গোগলার বিস্তীর্ণ প্রান্তর বিলীন হয়ে যাচ্ছে। বিলের ডোলকলমি ও হাওরের নলঘাস অবাধে কেটে নেওয়া হচ্ছে। অথচ উত্তরের পরিযায়ী পাখিরা তীব্র শীত থেকে বাঁচতে লক্ষ বছর ধরে পদ্মা-মেঘনা-যমুনার পলি দিয়ে গড়া এই সবুজ মোহনায় আসে। চীন ও মঙ্গোলিয়ার তুন্দ্রা অঞ্চল থেকে আসে চকাচকি নামের এক ধরনের বুনোহাঁস। পনেরো হাজার কিলোমিটার দূরের সাইবেরিয়া থেকে হিমালয় পার হয়ে দেশের বিলে আসে মাত্র পাঁচ গ্রাম ওজনের হলদে-ভ্রু-পাখি। এদের অস্তিত্বের সাথে ওতোপ্রতোভাবে জড়িয়ে আছে আমাদের বিল ও নদীর ডোলকলমির ঝোপ। এসব ঝোপঝাড়ে যদি পর্যাপ্ত পোকা পাওয়া যায় এবং দেশের জলাধার ও তৃণভূমিতে তারা নিরাপদে থাকতে পারে, তাহলে আবার তারা তুষারমুক্ত সাইবেরিয়া ফিরে বাসা বেঁধে বংশবৃদ্ধি করতে পারবে। কিন্তু ধনীর দুলালের বন্দুক, পাখি-শিকারির বিষ টোপ, অবাধে ঝোপঝাড় উজাড়, জলাভূমি ভরাট বা কৃষিক্ষেতে বিষ বর্ষনের ফলে পাখিরা কোথাও নিরাপদ নয়। এর পাশাপাশি বট, পাকুর, কদম, ডুমুর, পলাশ, শিমুল, মান্দারের মত পাখিদের আহার যোগানো গাছ হারিয়ে যাওয়ার ফলে পাখিদের বছরব্যাপী খাদ্য নিরাপত্তা মারাত্মক হুমকির মুখে।[১০৩]

একসময় বাংলাদেশের ফল বাগান ও কৃষিক্ষেতগুলো ছিল ফিঙে, দামা, ফটিকজল, তিতপাখি, সুইচোরা, সাহেলি, ছাতারে, কাঠকুড়ালি, বেনে বউ, বুলবুল ইত্যাদি পাখিদের ভোজনের আদর্শ জায়গা। এমনকি রাজধানী ঢাকা নগরীর জলাশয়গুলো ২০-৩০ বছর আগেও পাখি ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের সমৃদ্ধ ছিল। কিন্তু নগরীরর নামে বস্তি বানিয়ে তার সবই ধ্বংস করে ফেলা হয়েছে। বিগত দুইশো বছরে দেশের মানুষ শিক্ষিত হয়ে শহুরে হয়েছে। কিন্তু প্রাকৃতিক বন আর বন্যপ্রাণী সম্বন্ধে আদি আমলের জ্ঞান ও ভালবাসা হারিয়ে গেছে।[১০৪]

অর্থাৎ সার্বিকভাবে বাংলাদেশের পরিবেশ ও প্রাণবৈচিত্র্য ভাল নেই। নানা আন্তর্জাতিক সমীক্ষাতেও এই চিত্র ফুটে উঠছে। গ্রামের মানুষ আগে বিল থেকে বকের উড়ে যাওয়া দেখে বুঝতে পারতেন যে এখনই বৃষ্টি নামবে। অথবা নীচু জমিতে পাখির বাসা বানানো থেকে বন্যার পূর্বাভাস পেয়ে সেই অনুযায়ী ফসল নির্বাচন ও আবাদ করা হত। কিন্তু এসব জ্ঞান বর্তমান তরুন প্রজন্মের অধিকাংশের মাঝে প্রবাহিত হয়নি। তারা স্মার্টফোন থেকে আবহাওয়ার পূর্বাভাস জানতে পারছে। বিদেশ থেকে তাদের জন্য প্যাটেন্ট করা বীজ ও বিষের প্যাকেজ আসছে। কিন্তু পরিবেশের দিকে তাকানোর ফুরসত তাদের অধিকাংশেরই নেই। পাঠ্যপুস্তক ও সংবাদপত্রের প্রতিবেদন থেকে জলবায়ু পরিবর্তনের ভয়াবহতা সম্পর্কে ধারনা পেলেও আধুনিক জীবন যাপন কিভাবে জলবায়ু পরিবর্তন তরান্বিত করছে সেই বিষয়ে বোঝাপড়া বা সংবেদনশীলতা তৈরি হয়নি। ফলে দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপিঠে অনটাইম কাপে চায়ের আড্ডা বসছে, আর শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত মিটিংরুমে পরিবেশ দিবসের আয়োজন চলছে। আর উন্নয়নের ডামাদোলে বিলীন হয়ে যাচ্ছে দেশের নদী, জলাধার, বন, পশুপাখি এবং জনগণের পরিবেশ সচেতনতাবোধ। বর্তমান আধিপত্যবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সাথে তাল মিলাতে প্রবৃদ্ধি লাগবে, এজন্য বিদ্যুৎ লাগবে, কলকারখানার জন্য জমি লাগবে, নতুন সড়ক লাগবে, সড়কে নতুন লেন লাগবে। এজন্য চলনবিলের বুক চিরে গেলে, বা সুন্দরবন দূষিত হলে, অথবা হাতির বাসস্থান দ্বিখন্ডিত হলে- কিছু যায় আসে না। পরিবেশ ন্যায্যতা ও জলবায়ু সুবিচারের আলাপ এখানে অবান্তর। কিছু নাগরিক সংগঠন এবং পরিবেশ আন্দোলনকর্মী এসব বিষয়ে নিয়মিত প্রতিবাদের ঝড় তুললেও দেশের আপামর জনগণ এসব আন্দোলনে সম্পৃক্ত হতে আগ্রহ বোধ করেন না।

এর পাশাপাশি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিপ্রেমী গবেষকদের মিথ্যাচার এসব আন্দোলনের গুরুত্ব হ্রাস করে। অর্থনীতি ও ভোগবাদের কাছে পরিবেশের পরাজয়ের ফলে প্লাস্টিক নিষিদ্ধকরণ আইনের মত নির্মল পরিবেশের জন্য সহায়ক আইনগুলোর বাস্তব প্রয়োগ হয় না। ডিজিটাল মাধ্যমে ক্ষমতাধরদের নিয়ে কোন কটু কথা লিখলে দেশের যেখানেই সে থাকুক সাথে সাথে তাকে গ্রেফতার করা সম্ভব হলেও প্রকাশ্যে নদী দখলকারী, অবৈধ বালু উত্তোলনকারী বা পরিবেশ দূষণকারীদের খুঁজে পাওয়া যায় না। ফলে দেশের আয় বাড়লেও বিলিন হতে থাকে প্রাণ-প্রকৃতি, অসুস্থতায় নিমজ্জিত হতে থাকে সর্বস্তরের জনগণ এবং সুজলা সুফলা শস্য-শ্যামলা বাংলা একটি দূষিত, বিষাক্ত ও মরুময় ভূখন্ডে পরিণত হওয়ার পথে এগিয়ে যেতে থাকে।

মানুষের বা বলা ভাল ধনী মানুষের এহেন কার্যক্রমের ফলে শিল্প বিপ্লবের সময় থেকে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা প্রায় ১.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেড়ে গেছে। জলবায়ুগত মহাবিপর্যয় এড়াতে এই শতকের মধ্যে তাপমাত্রা বৃদ্ধি ১.৫ ডিগ্রির মধ্যে রাখার ব্যাপারে বিশ্ব নেতারা বছরের পর বছর আলোচনা করে যাচ্ছেন।[১০৫] অথচ ১৯৫০-এর দশক থেকেই বিজ্ঞানীরা বায়ুমন্ডলে ক্রমাগত কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস বৃদ্ধির ফলে পৃথিবী গরম হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে আশঙ্কা প্রকাশ করা শুরু করেছিলেন। কিন্তু তেল, কয়লা, গ্যাস প্রভৃতি জীবাশ্ম জ্বালানি কোম্পানিগুলো এই সংকট স্বীকার না করে বরং ভ্রান্ত তথ্য প্রচার করতে থাকে। বিজ্ঞানী ও নাগরিক সমাজের ক্রমাগত প্রতিবাদের প্রেক্ষিতে ১৯৯২ সালে জাতিসংঘের উদ্যগে বিশ্বনেতারা ৩টি চুক্তি করতে বাধ্য হন। এগুলো হচ্ছে ১. জলবায়ু পরিবর্তন কনভেনশন (UNFCCC), ২. জীববৈচিত্র্য কনভেনশন এবং ৩. মরুকরণ রোধ কনভেনশন। এসব চুক্তির মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তন, জীববৈচিত্র্য ও মরুকরণ রোধে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার ব্যাপারে বিশ্ব নেতারা অঙ্গীকারবদ্ধ হলেও বাস্তবে উল্লেযোগ্য অগ্রগতি হয়নি। বরং জলবায়ু সম্মেলনগুলোতে বহুজাতিক কোম্পানি ও ধনী দেশের প্রতিনিধিরা কার্বন নির্গমন বন্ধের সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেন। ক্ষতিগ্রস্ত জনপদের অধিবাসীরা সেখানে জলবায়ু সুবিচার থেকে বারবার বঞ্চিত হয়। অথচ ২০২২ সালে মন্ত্রী পর্যায়ের আন্তর্জাতিক সম্মেলনে জাতিসংঘের মহাসচিব

আন্তোনিও গুতেরেস সরাসরি বলেন, *আমাদের সামনে দুটি বিকল্প থেকে একটি চেছে নেওয়ার সুযোগ রয়েছে। হয় জলবায়ু পরিবর্তন রোধে একযোগে উদ্যোগ নিতে হবে, নয়তো একযোগে আত্মহত্যা করতে হবে। জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহারের অভ্যাস বদলাতে না পারলে কোন দেশই জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত থেকে নিজেদের সুরক্ষিত রাখতে পারবে না। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বন্যা, খরা, ঝড়, দাবানল বাড়ছে। এসব প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে মানবজাতির অর্ধেক চরম বিপদে রয়েছে।*[১০৬]

আগুনের ব্যবহার রপ্ত করার মাধ্যমে মানুষ খাদ্য শৃঙ্খলের চূড়ায় অবস্থান করে। কিন্তু বৈচিত্র্যময় স্থানীয় খাদ্যের পরিবর্তে কতিপয় নির্দিষ্ট প্রজাতির ফসল উদ্ভিদ ও গৃহপালিত প্রাণীর উপর সারা দুনিয়ার অধিকাংশ মানুষ নির্ভরশীল হয়ে গেছে। ফলে শুধু গবাদিপশুর খাদ্য উৎপাদনের জন্যই মোট কৃষিজমির ৩ ভাগের ২ ভাগ ব্যবহৃত হচ্ছে।[১০৭] ভূট্টা, সয়াবিন, পাম তেল, গম, ধান ইত্যাদি একক ফসলের জমি বহুগুণ বৃদ্ধি করায় উচ্ছেদ হয়েছে গহীন ও দূর্গম জঙ্গলের প্রাচীন উদ্ভিদরাজি, আর আবাস হারিয়েছে বন্যপ্রাণীকূল। পাশাপাশি চলছে কয়লা, তেল, গ্যাস, রাসায়নিক সার তৈরির খনিজ উপকরণ, ইলেকট্রনিক্স পণ্যের জন্য প্রয়োজনীয় ধাতু ইত্যাদি যত দ্রুত সম্ভব নিঃশেষ করার প্রতিযোগিতা। ফলে অবাসযোগ্য ও দূষিত হয়ে যাচ্ছে বিপুল পরিমাণ জল ও জমিন।



ছবি ঃ বিস্তির্ণ অঞ্চলে চাষ হচ্ছে শিল্পায়িত কৃষিনির্ভর একক ফসল ধান

বাংলাদেশেও ক্রমে বিদ্যুৎ ও সিলিন্ডার গ্যাস ব্যবহার বাড়ছে। এলএনজি গ্যাস আমদানির জন্য বিশাল টার্মিনাল তৈরি করা হচ্ছে। বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য বৈদেশিক ঋণে বানানো হচ্ছে মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ ও বিপজ্জনক কয়লা ও পরমাণু নির্ভর বিদ্যুৎ কেন্দ্র। বাড়ছে ব্যাটারি, নানা ধরনের ইলেকট্রনিক চিপ ও সোলার প্যানেল। পশ্চিমা জীবনযাপনে অভ্যস্ত হতে যেয়ে প্রতি পদে পদে দূষণ বাড়ছে। কিন্তু জীবাশ্ম জ্বালানিসহ বিভিন্ন বহুজাতিক কোম্পানিগুলো ব্যাপক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী। সংযুক্ত আরব আমিরাতে ২০২৩ সালে অনুষ্ঠিত কপ-২৮ বা আন্তর্জাতিক জলবায়ু সম্মেলনের সভাপ্রধান ছিলেন সেদেশের জাতীয় তেল কোম্পানির প্রধান নির্বাহী। তেল কোম্পানির প্রধান কিভাবে জীবাশ্ম-জ্বালানিমুক্ত ভবিষ্যতের আহ্বান করবেন তা বিস্ময়কর হলেও এটাই বাস্তবতা।[১০৮] ১৩ দিন ব্যাপী এই জলবায়ু সম্মেলনে ২০০ দেশের প্রায় ৮৫ হাজার প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলনের শেষ দিনে বৈশ্বিক নেতাদের মধ্যে *ট্রানজিশন অ্যাওয়ে* বা জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে সরে আসার চুক্তি হয়েছে। এই চুক্তির মধ্য দিয়ে জলবায়ু সংকটের মূল অপরাধীর উপর সবার দৃষ্টি পড়েছে। তবে এই চুক্তিতেও দূষণকারী দেশ ও কোম্পানিগুলোর জন্য অনেক ফাঁক রয়ে গেছে।[১০৯] এই চুক্তি বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে নিশ্চিতভাবে যুবসমাজেরই সবচেয়ে বেশি দায়িত্ব নিতে হবে। এক্ষেত্রে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের যুবরা নানা ধরনের সৃজনশীল পদক্ষেপ নিচ্ছেন এবং পরিবেশ ও বৈষম্য বিরোধী তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলছেন।[১১০]



ছবি ঃ ধান, ভূট্টার মতএকক ফসল চাষের প্রসারের ফলে হারিয়ে যাচ্ছে কাউনের মত ঐতিহ্যবাহী ফসলের চাষ

উপসংহার

জলবায়ু-উত্তাল এক পৃথিবীতে ভবিষ্যত প্রজন্মের সামনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অভাবনীয় সম্ভাবনা হাজির হয়েছে। যুবসমাজ এসব প্রযুক্তির অন্যতম উপকারভোগী ও অভীষ্ট শ্রেণি। এসব প্রযুক্তির মোহে যুবসমাজ কী পৃথিবীর প্রাণের চক্রের দুরবস্থার কথা ভুলে যাবে? নাকি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে পৃথিবীকে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করবে? কৃত্রিম পরিসরে প্রাণ-প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় জীবন যাপনের ব্যাপক আয়োজন চলছে সারা বিশ্বে। মানুষ ও কম্পিউটারের শারীরিক ও মানসিক মিথস্ক্রীয়ার গবেষণায় দেদার খরচ করা হচ্ছে। এভাবে যে যন্ত্রমানব তৈরি হবে তারা মরবে না, শুধু কাজ করবে আর উৎপাদন বাড়াবে। কিন্তু এসব আয়োজন করতে যেয়ে পৃথিবীর অবশিষ্ট প্রাকৃতিক উপাদানগুলোও দ্রুত নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ভোগবাদের চিৎকারে ধরিত্রীর আর্তনাদ চাপা পড়ে যায়। নির্ভরযোগ্য নানা সূত্রের বরাতে জানা যাচ্ছে যে, পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি, দূষণ ও ভোগের ধারা অব্যাহত থাকলে এটি দ্রুতই বাসযোগ্যতা হারাবে। আর এর প্রধান ভুক্তভোগী হবে প্রকৃতি নির্ভর ও বঞ্চিত জনগোষ্ঠী। আবার বর্তমানে এটাও স্পষ্ট যে, অল্প কিছু মানুষ কর্তৃক পৃথিবীর তাবৎ সম্পদ কুক্ষিগত করার ফলেই বিশাল সংখ্যক মানুষ দরিদ্র অবস্থায় দিনাতিপাত করছে। এসব ধনিক শ্রেণির মানুষের নজর এখন অন্য গ্রহে। এই অনিন্দ্য সুন্দর পৃথিবীর সম্পদগুলো নির্বিচারে লুটপাত করেই তাদের ভিনগ্রহে যাবার বা সেখানকার প্রাকৃতিক উপাদান লুটপাতের আয়োজন করতে হচ্ছে। এতে পৃথিবীর ও মহাবিশ্বের প্রাকৃতিক উপাদানের উপর জন্মগত অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে অন্যরা। শুধু মানুষ নয় এসব ধনিক শ্রেণির লোভের বলি হচ্ছে পৃথিবীর অন্যান্য বাসিন্দারাও। ভূমি, জল, বাতাস- কোনটাই এখন প্রাণবৈচিত্র্যের বেঁচে থাকার জন্য নিরাপদ নয়।

অথচ পৃথিবীর তাবৎ প্রাণী, উদ্ভিদ, ছত্রাক, অণুজীব একে অপরের সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। আর এসব প্রাণের আধার হিসাবে আছে জড় উপাদানগুলো। সবকিছু একসাথে মিলেমিশে পৃথিবীতে প্রাণ বেঁচে থাকার মত পরিস্থিতি তৈরি হয়। কিন্তু যখন মানুষের অতি আহরণ ও ভোগের কারণে মাটি-পানি-বাতাস-খনিজের মত জড় পদার্থগুলো ক্রমে দূষিত ও

দখল হতে থাকে এবং নিটোল বাস্তুতন্ত্রগুলো ময়লার ভাগাড়ে পরিণত হয়, তখন একটার পর একটা প্রজাতি বিলুপ্ত হতে থাকে। এক প্রজাতির প্রাণ বিলুপ্ত হয়ে গেলে এর প্রভাবে সেই প্রাণের সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য প্রাণ ও জড়ের অস্তিত্বও বিপন্ন হয়ে পড়ে। এভাবে পৃথিবীর প্রাণবৈচিত্র্যের পরস্পরনির্ভরশীল নিবিড় সম্পর্কগুলো আলগা হয়ে যায়, যার নেতিবাচক প্রভাব পড়ে সামগ্রিক পরিবেশের উপর। অন্যদিকে ক্রমাগত নানা দূষিত বর্জ্য নিক্ষেপের মাধ্যমে পৃথিবীতে প্রাণের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা পানি, কার্বন, নাইট্রোজেন প্রভৃতি চক্রগুলো বিপর্যস্ত হয়ে সার্বিকভাবে পৃথিবীটা ক্রমে বসবাসের অনুপযুক্ত হয়ে পড়ে।

এই পৃথিবীর আকার সীমাবদ্ধ। অথচ সীমাবদ্ধ উপাদান দিয়ে মানুষকে অসীম প্রবৃদ্ধির মরীচিকা দেখানো হচ্ছে। এটা কিভাবে সম্ভব? সাধারণ জ্ঞান বলে এটি সম্ভব নয়। কিন্তু লাভ ও লোভের মোহে ফেলে মানুষকে এই অসম্ভব প্রতিযোগিতায় ঠেলে দেওয়া হয়েছে। আর এর প্রধান উপকারভোগী অল্প কিছু অতি ধনী মানুষ। এজন্য হাজার হাজার বছর ধরে সমাজে তৈরি হওয়া পরিবেশ সচেতনাবোধ, নৈতিকতা ও মানবিকতা ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। সহমর্মিতা ও সহযোগিতার পরিবর্তে নির্মম প্রতিযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে মানুষে মানুষে বিভেদের দেয়াল নির্মাণ করা হয়েছে। সহিংসতা ও যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় অস্ত্র-গোলা-বারুদ-রাসায়নিক সরবরাহ করে মানুষকে উসকে দেওয়া হচ্ছে একে অপরকে বিনাশ করে দিতে। আন্তঃরাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলোর পেছনে ব্যাপক অর্থ খরচ করা হলেও এসব ক্ষেত্রে কী তারা যথাযথ ভূমিকা নিতে পারছে? বিভিন্ন ফোরামে এখন এসব প্রশ্ন উত্থাপিত হচ্ছে। কিন্তু এসব প্রশ্নের যথাযথ উত্তর পাওয়া যায় না। বিশ্বের নেতারা সামাজিক ও পরিবেশ ন্যায্যতা বিষয়ক নানা ধরনের চুক্তি ও সনদ স্বাক্ষর করলেও সেগুলো বাস্তবায়নে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয় না। একদিকে পরিবেশ ও জলবায়ু বিপর্যয়, অন্যদিকে মানুষে মানুষে অসমতা ও সংঘাত- এক জটিল ও নির্মম পরিস্থিতি তৈরি করছে।

প্রবৃদ্ধিনির্ভর অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় পৃথিবীতে প্রাণী হিসাবে মানুষের ভূমিকা ভোক্তায় সংকুচিত করা হয়েছে। ভোক্তা হিসাবে বাজার থেকে পণ্য ক্রয় করা ছাড়া তার যেন আর কিছুই করার নেই। প্রাত্যহিক জীবনের প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো কিভাবে তৈরি হচ্ছে অথবা এগুলোর সাথে সম্পৃক্ত

শ্রমশক্তি যথাযথ মূল্যায়িত হয়েছে কিনা অথবা ব্যবহারের পর প্রকৃতিতে ফেরত যাওয়ার এগুলো কী প্রভাব ফেলে- কিছুই জানার দরকার নেই। বিশ্বজুড়ে হাজার হাজার বছর ধরে স্থানভেদে মানুষের কত বিচিত্র খাদ্যাভাস, সংস্কৃতি ও যাপন পদ্ধতি গড়ে উঠেছিল। এসব বৈচিত্র্য মুছে দিয়ে সকলকে একই খাবার, একই বিনোদন, একই যাপন পদ্ধতিতে নিয়ে আসার নিরন্তর আয়োজন চলছে। এজন্য প্রযুক্তির সহায়তায় বিজ্ঞাপনের মায়াজাল বিস্তার করে স্থানীয় সংস্কৃতি ও মূল্যবোধগুলোকে অপমান করা হয়। চাপিয়ে দেওয়া হয় শুধুমাত্র অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক যাপন পদ্ধতিগুলোকে। এতে নিশ্চিত হয় পুঁজির পুনরুৎপাদন ও বাড়তে থাকে বাজারের পরিধি। কিন্তু মানুষের সাথে মাটি, পানি ও পরিবেশের সম্পর্ক ক্রমে আলগা হতে থাকে, অবক্ষয় হতে থাকে প্রাণ-প্রকৃতির, আর বাড়তে থাকে অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্য।

এর বিপরীতে বিশ্বের নানা প্রান্তে বৈষম্যবিরোধী ও পরিবেশ আন্দোলন ক্রমে দানা বেঁধে উঠছে। জেল-জুলুমের তোয়াক্কা না করে আন্দোলনকারীরা এসব চক্রান্ত জনগণের সামনে তুলে ধরা এবং জনগণকে এর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করছেন। পরিবেশ সুরক্ষা, জলবায়ু সংকট, বর্ণবাদ, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অসমতা, মত প্রকাশ, কর্মসংস্থান, ব্যক্তিগত গোপনীয়তার সুরক্ষা, নারী ও অন্যান্য জেন্ডারের অধিকার প্রভৃতি ইস্যুতে চলমান আন্দোলনগুলো ক্রমে একত্রিত হচ্ছে এবং ন্যায্য রূপান্তরণের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠার এই লড়াইতে বাংলাদেশের বিশাল সংখ্যক যুব কতটা সামিল হবে? তারা কি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অবারিত দ্বারের সন্ধান পেয়ে স্থানীয় পরিবেশকে আরও ভুলে যাবে, নাকি এসব প্রযুক্তি ব্যবহার করে চলমান সামাজিক ও পরিবেশগত অবিচারের বিরুদ্ধে একত্রিত হবে? পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর প্রযুক্তি ছুঁড়ে ফেলে স্থানীয় পরিবেশের সাথে মানানসই টেকসই প্রযুক্তি, লোকায়ত জ্ঞান ও প্রাণবান্ধব জীবনধারা অন্বেষণ ও চর্চা করা ছাড়া তাদের আর কী বিকল্প আছে? এজন্য প্রয়োজন নিজের আশেপাশের প্রাণ-প্রকৃতিকে ভালভাবে চেনা ও যত্নবান হওয়া। এছাড়া চলমান আগ্রাসী উন্নয়ন ও ভোগবাদী ব্যবস্থার সংকটগুলোর বিপরীতে সেবামূলক কার্যক্রম, সুখ এবং স্থানীয় উৎপাদন ও টেকসই ভোগের যৌথ অনুসন্ধান প্রয়োজন। এক্ষেত্রে সরকারি-বেসরকারি-সামাজিক-রাজনৈতিক পরিসর থেকে তাদেরকে উজ্জীবিত করা হবে, নাকি

তাদেরকে ডিজিটাল অন্ধ-বধির জনগোষ্ঠী বা যন্ত্রমানবে রূপান্তরণে সহায়তা করা হবে? এসব মৌলিক প্রশ্নের ফায়সালার উপর নির্ভর করছে এই ভূখন্ডের ভবিষ্যত।

স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকার জন্য মানুষসহ অন্যান্য প্রাণের প্রয়োজন হয় নির্মল বাতাস, বিশুদ্ধ পানি ও নিরাপদ খাদ্য। মূলত খাদ্য সংগ্রহের মাধ্যমে প্রকৃতির সাথে মানুষের সংঘর্ষ শুরু হয়। তাই বর্তমান প্রাণ-প্রকৃতি বিধ্বংসী কৃষি উৎপাদন পদ্ধতির মৌলিক রূপান্তর দিয়ে বর্তমান ব্যবস্থার পরিবর্তন শুরু হতে পারে। প্রায় দশ হাজার বছরের কৃষিজ্ঞান এবং পরিবেশ সংরক্ষণের ট্রাডিশনগুলো এক্ষেত্রে পথ দেখাতে পারে। খাদ্য ছাড়াও বস্ত্র, বাসস্থান, বিনোদন, চিকিৎসাসহ অন্যান্য যেসব উপকরণ মানুষের জীবন ধারণের জন্য একান্ত প্রয়োজন সেগুলো কিভাবে আরও ন্যায্য উপায়ে সংগ্রহ করা যায় সে ব্যাপারে স্থানীয় নানা সমাধান রয়েছে। এসব ট্রাডিশন, মূল্যবোধ এবং যাপন পদ্ধতির অনুসন্ধান ও প্রসারের মাধ্যমে টেকসই জীবন ধারা ও সুন্দর জীবন অর্জন সম্ভব। সার্বজনীন সুন্দর জীবনের জন্য সমাজ, পরিবেশ ও সংস্কৃতির নিবিড় সংহতি প্রয়োজন। মানুষ প্রকৃতির মালিক নয়, বরং এর একটি ক্ষুদ্র অংশ- এই বোধসম্পন্ন মানুষের স্থানীয়, জাতীয় ও আঞ্চলিক ঐক্য ও যোগাযোগ প্রতিষ্ঠায় সৃজনশীল কার্যক্রম বাস্তবায়ন জরুরী। প্রকৃতির ঐকতানে সতেজ ও শোষণমুক্ত সামাজিক সম্পর্কে আচ্ছন্ন জীবন যাপন উপযোগী একটি সুখী ও আনন্দময় পৃথিবীর জন্য লড়াই করা ছাড়া আমাদের আর কী করার আছে?

তথ্যসূত্রঃ

১. Nazmul Ahsan, Putting national policy in force, Daily New Age, 27.10.2022

২. https://policy.gov.bd/search/policy?search-key=%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A6%BF+

৩. ৬৯ শতাংশ তরুণ মনে করে, উন্নয়নে মূল বাধা দুর্নীতি-স্বজনপ্রীতি, দৈনিক ইত্তেফাক, ১৫.১০.২০২৩

৬৯.৪% তরুণের মতে, বাংলাদেশের উন্নয়নের পথে প্রধান বাধা দুর্নীতি: সমীক্ষা, দি বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড, ১৪.১০.২০২৩

৪. ত্রৈমাসিক শ্রমশক্তি জরিপ ২০২৩: ৩য় কোয়ার্টার (জুলাই-সেপ্টেম্বর), বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, ঢাকা

৫. নাগরিক প্লাটফর্ম ব্রিফিং নোট ২৭: বাংলাদেশের শিক্ষিত যুবরা কাজ পাচ্ছে না কেন? বাজার কী বলে?, এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্লাটফর্ম, বাংলাদেশ, ২০২২ (https://bdplatform4sdgs.net/wp-content/uploads/2022/09/Briefing-Note-27.pdf)

৬. সিপিডির সংলাপ: 'পূর্বাচল এখন ট্যাক্স হ্যাভেনে পরিণত হয়েছে', দৈনিক প্রথম আলো, ২৪.০৫.২০২৩

সাদ্দাম হোসাইন, রাজউকের প্লট বরাদ্দ: ক্ষমতাবান স্বামী-স্ত্রীদের প্লট দিতে পাল্টে যাচ্ছে রাজউকের বিধি, দৈনিক প্রথম আলো, ২৭.০৭.২০২২

তোফাজ্জল হোসেন রুবেল, 'ভুল মানুষের' হাতে পূর্বাচল, দৈনিক দেশ রূপান্তর, ২৫.০১.২০২২

৭. তোফাজ্জল হোসেন রুবেল, গরিব নিঃস্ব, ধনী আরও ধনী, দৈনিক দেশ রূপান্তর, ২২.১২.২০২২

৮. ফারজানা লাবনী, ৫ হাজার কোটি টাকা পাচার, দৈনিক দেশ রূপান্তর. ০৬.১২.২০২২

https://www.bbc.com/bengali/news-47037982

৯. ফারজানা লাবনী, যে ক্ষতি হয় অর্থ পাচারে, দৈনিক দেশ রূপান্তর. ০৭.০৫.২০২২

১০. https://www.prothomalo.com/business/economics/5crmk57q8p

১১. এটিএম নুরুল আমিন, ২০২৩, *অনানুষ্ঠানিক খাত: দারিদ্র্য, বেকারত্ব ও অসমতা*, সর্বজনকথা, ৯ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা

১২. https://mof.portal.gov.bd/sites/default/files/files/mof.portal.gov.bd/page/f2d8fabb_29c1_423a_9d37_cdb500260002/8.%20Executive_Summary%20%28Bangla-2023%29_Final%20%281%29.pdf

১৩. https://mwb.portal.gov.bd/site/page/dd0d5638-5303-4869-af41-ea321807408e/-

১৪. তসলিমা আখতার, মজুরির হিসাব-নিকাশ: পোশাক শিল্পের অগ্রগতি ও শ্রমিকের জীবন, দি ডেইলি স্টার বাংলা, ০১.১০.২০২৩

তানজিলা আমির, বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্প খাতের চ্যালেঞ্জ, দৈনিক বণিকবার্তা, ১০.১০.২০৩

https://bangla.thedailystar.net/news/bangladesh/news-529131

১৫. তাসলিমা আখতার, ২০২২, *দ্রব্যমূল্য, শ্রমিকের জীবন ও মজুরি প্রশ্ন*, সর্বজনকথা, ৮ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা

সাড়ে ১২ হাজার টাকা ন্যূনতম মজুরির সিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যান, শ্রক্রবার শ্রমিক সমাবেশ, দি ডেইলি স্টার বাংলা, ০৭.১১.২০২৩

ন্যূনতম মজুরি প্রত্যাখ্যান ও শ্রমিক নিহতের ঘটনার বিচার দাবিতে সমাবেশ, বিক্ষোভ, দৈনিক প্রথম আলো, ১০.১১.২০২৩

১৬. https://bangla.thedailystar.net/economy/news-439511

১৭. ইয়াহইয়া নকিব, সরকারের বিভিন্ন সংস্থার ভিন্ন তথ্য: প্রবাসীর সংখ্যা আসলে কত?, দৈনিক বণিকবার্তা, ২৯.১১.২০২৩

১৮. https://www.prothomalo.com/bangladesh/dulaaqq8o7

১৯. https://bangla.thedailystar.net/business/news-546056

২০. https://www.prothomalo.com/opinion/editorial/1zvrudwby1

২১. মইনুল ইসলাম, ২০১৭, বাংলাদেশের রাষ্ট্রচরিত্র ও অনুন্নয়ন, শৈলী প্রকাশন, ঢাকা, পৃ ১১-১৫

২২. পূর্বোক্ত, পৃ ৮

২৩. পূর্বোক্ত, পৃ ১৯-২৫

২৪. আনু মুহাম্মদ, ২০১৯, রাষ্ট্র আছে রাষ্ট্র নাই, সংহতি প্রকাশন, ঢাকা, পৃ ১৫-২৪

২৫. মমতাজ উদ্দিন আহমদ, এ.জি.এম. নিয়াজ উদ্দিন, নিয়াজ আহমদ খান, ২০০৯, প্রাচীন ভারতবর্ষে সুশাসন ব্যবস্থা: কৌটিল্য ও অশোকের শাসনচিন্তা ও তার বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা, *Society & Change*, Vol. III, No.2, April-June 2009

২৬. নীহার কুমার সরকার, ২০১৪ [২০০১], ছোটদের অর্থনীতি, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী সংস্করণ, কলকাতা

২৭. এম এন রায়, বিংশ শতাব্দীর সংকট, শতবর্ষ স্মারকগ্রন্থ ঃ এম, এন, রায়, বাসন্তী গুহঠাকুরতা (সম্পাদিত), পরিবর্তন প্রকাশনী সংস্থা, ঢাকা ১৯৮৭, পৃ ২২

২৮. https://pressinform.portal.gov.bd/sites/default/files/files/pressinform.portal.gov.bd/page/50aa82ee_7a92_4aa7_817b_bb323c098833/2022-02-20-04-29-f12241394d5b73aaa1442c3a631bb1cf.pdf

২৯. মওদুদ আহমদ সুজন, প্রতি ৩ ক্যানসার রোগীর ২ জন মারা যান বিনা চিকিৎসায়, দি ডেইলি স্টার বাংলা, ০৪.০২.২০২৩

৩০. সানজানা চৌধুরী, কিডনি রোগী এক বছরে বেড়ে দ্বিগুণ, চিকিৎসার খরচ এতো বেশি কেন, বিবিসি নিউজ বাংলা, ০৯.০৩.২০২৩

৩১. শিশির মোড়ল, দেশে ৩৪ শতাংশ মৃত্যু হৃদরোগে, দৈনিক প্রথম আলো, ২৯.০৯.২০২২

৩২. প্রতি ১০ জনে ৭ জনের মৃত্যু অসংক্রামক রোগে, দৈনিক যুগান্তর, ২৭.০১.২০২২

৩৩. আলতাফ পারভেজ (অনুবাদক), ২০২০, রাষ্ট্র ও ভাবাদর্শ, সংহতি প্রকাশন, ঢাকা, পৃ ৩১, ৩৯, ৪৫, ১০২, ১০৩

৩৪. অরুন্ধতী রায় (অনুবাদক: মাধব বন্দোপাধ্যায়), ২০১৩, পুঁজিবাদ : এক ভৌতিক কাহিনী, শ্রাবণ প্রকাশনী, ঢাকা, পৃ ২২-৩৩

৩৫. চৌধুরী মুজাদ্দিদ আহমদ, ২০২৩, *টমাস পিকেটি ও আইএমএফ- অসমতার বিতর্ক*, সর্বজনকথা, ৯ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা

৩৬. দেবল দেব, বিচ্যুত স্বদেশভূমি: বাংলার জৈব সংস্কৃতির লুপ্তাবশেষের সন্ধান, ধ্যানবিন্দু ও বসুধা, কলকাতা, ২০২১, পৃ ৯৩-৯৫

৩৭. সুধাংশু কুমার রায়, ড. মুহাম্মদ কুদরাত-এ-খুদা, শেখর দত্ত ও রুশো তাহের সম্পাদিত দুই প্রজন্মের বাঙালি বিজ্ঞানী স্মারকগ্রন্থ 'ড. কুদরাত-এ-খুদা, স্টারট্রেক ড্রিম, ঢাকা, পৃ ২৪-২৬

৩৮. অমিতা চক্রবর্ত্তী, ফারজানা শম্পা, নাসরিন সিরাজ ও আনু মুহাম্মদ (সম্পাদিত), ২০০৮, পাট ঃ শিল্প ও শ্রমিক, পদাতিক প্রকাশনী, পৃ ৩

৩৯. ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ, ২০২৩, উন্নয়নশীল দেশের গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র: একটি রূপরেখা, বাতিঘর, ঢাকা, পৃ ৫৮, ২৫

৪০. https://www.theguardian.com/us-news/2021/sep/12/occupy-wall-street-10-years-on

৪১. Bangladesh steps down 2 notches on ICT index, The Daily Star, 23.11.2023

৪২. https://www.itu.int/itu-d/reports/statistics/2023/10/10/ff23-internet-use/

৪৩. https://www.itu.int/itu-d/reports/statistics/2023/10/10/ff23-youth-internet-use/

৪৪. https://harrityllp.com/infographic-top-15-companies-obtaining-patents-in-2022/
https://www.nasdaq.com/articles/who-are-the-worlds-largest-patent-holders

৪৫. বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-২০২২, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা

৪৬. ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব, ২০২০, চতুর্থ শিল্পবিপ্লব ও বাংলাদেশ, আদর্শ, ঢাকা, পৃ ৪৪-৪৬

৪৭. পূর্বোক্ত, পৃ ৩১৩-৩৩৯

৪৮. 84.9pc youth in Bangladesh lack basic digital skills: UN, The New Age, 14.07.2022

৪৯. মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ: ম্যানুফাকচারিং-এ ১৬-৩০ জন কর্মরত এবং ১০ থেকে ৫০ লাখ টাকার সম্পদ আছে। আর সেবা খাতের ক্ষেত্রে ১৫ জনের কম কর্মরত এবং সম্পদের পরিমাণ ১০ লাখ বা এর কম।

ক্ষুদ্র এন্টারপ্রাইজ: ম্যানুফাকচারিং-এ ৭৫ লাখ থেকে ১৫ কোটি টাকার সম্পদ আছে এবং/অথবা ৩১-২০ জন কর্মরত। আর সেবা খাতের ক্ষেত্রে ১০ লাখ থেকে ২ কোটি টাকার সম্পদ অথবা ১৬-৫০ জন কর্মরত।

মাঝারি এন্টার প্রাইজ: ম্যানুফাকচারিং-এ ১২১-৩০০ জন কর্মরত এবং জমি ও কারখানা ভবন বাদে ১৫ থেকে ৫০ কোটি টাকার সম্পদ আছে। আর সেবা খাতের ক্ষেত্রে ৫১-১০০ জন কর্মরত এবং জমি ও ভবন বাদে ২ থেকে ৩০ কোটি টাকার সম্পদ আছে।

৫০. Information and Communication Technology (ICT) Adoption of SMEs in Bangladesh: Present Schenario, Challenges and Way Forward, Friedrich-Elbert-Stiftung (FES), Dhaka, 2021

৫১. ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব, ২০২০, চতুর্থ শিল্পবিপ্লব ও বাংলাদেশ, আদর্শ, ঢাকা, পৃ ৩২০-৩২২

৫২. এডওয়ার্ড স্নোডেন (অনুবাদক: মাহজাবিন খান), ২০২০, পার্মানেন্ট রেকর্ড, প্রজন্ম পাবলিকেশন, ঢাকা, পৃ ৮-১০, ১২১-১৩১

৫৩. ২০২৫ নাগাদ কোটি টনের ই-বর্জ্যের ভাগাড় হবে বাংলাদেশ, আজকের পত্রিকা, ০৪.০৬.২০২৩

৫৪. ফাহিম হোসাইন, ২০১৬, নারীর ক্ষমতায়ন, এসডিজি এবং তথ্য প্রযুক্তি: মডিউল C1, উইমেন অ্যান্ড আইসিটি ফ্রন্টিয়ার ইনিসিয়েটিভ, ঢাকা

৫৫. Hafkin, N. ,2002, Gender issues in ICT policy in developing countries: An overview. Paper presented at the UN division for the advancement of women expert group meeting on Information and 167 communication technologies and their impact on and use as an instrument for the advancement and empowerment of women, Seoul, Republic of Korea.

৫৬. Padovani, C.,2016, Gendering the european digital agenda: The challenge of gender mainstreaming twenty years after the Beijing World Conference on Women. Journal of Information Policy, 6(1), 403-435.

৫৭. Hafkin, N., 2002, Gender issues in ICT policy in developing countries: An overview. Paper presented at the UN division for the advancement of women expert group meeting on Information and 167 communication technologies and their impact on and use as an instrument for the advancement and empowerment of women, Seoul, Republic of Korea.

৫৮. Marcelle, G., 1998, Strategies for including a Gender Perspective in African Information and Communications Technologies (ICTs). Paper presented to ECA 40th Anniversary conference on Women and Developmen

৫৯. Opoku-Mensah, A., 2004,. Twin Peaks: WSIS from Geneva to Tunis: Whither Africa in the Information Society? Gazette (Leiden, Netherlands), 66(3-4), 253-273.

৬০. Gurumurthy, A., 2004, GENDER and ICTs: Institute of Development Studies, Gurumurthy, A., & Chami, N. (2014). Gender equality in the information society. Bangalore: IT for Change., Hafkin, N. J., 2006, Cinderella or cyberella?: Empowering women in the knowledge society: Kumarian Press, Sey, A., 2011, 'We use it different, different': Making sense of trends in mobile phone use in Ghana. New Media & Society, 13(3), 375-390, Tenhunen, S., 2018, A village goes mobile : telephony, mediation, and social change in rural India: New York, NY : Oxford University Press.

৬১. https://www.prothomalo.com/business/economics/aqrlikchmk

৬২. Data on Bangladesh population published by The United Nations Population Division's World Population Prospects, The World Bank, (2016). http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL.FE.ZS

৬৩. "Women's Inheritance Rights to Land and Property in South Asia: A Study of Afghanistan, Bangladesh, India, Nepal, Pakistan, and Sri Lanka." A report by the Rural Development Institute of the World Development Project., 2009, 32; http://www.landesa.org/wp-content/uploads/2011/01/

৬৪. Szirmai, A., 2005, *The dynamics of Socio-Economic development: An Introduction* (1st ed.): Cambridge University Press.

৬৫. UNPAN, 2007, Connecting People in Rural Communities through ICT: Grameen Telecom

৬৬. UNPAN, 2007, Connecting People in Rural Communities through ICT: Grameen Telecom

৬৭. S. N. Amin, V. Ganepola, F. Hussain, S. Kaiser and M. Mostafa, "Impact of conducting gender research on the researchers in the context of Muslim communities in developing countries", in Journal Advances in Gender Research: Special Issue on "At the Centre: Feminism, Social Science and Knowledge", vol. 20., M.T. Segal, ed. (Emerald, USA, 2015); and Rachel Masika and Savita Bailur, "Negotiating Women's Agency through ICTs: A Comparative Study of Uganda and India", in Gender Technology and Development, vol. 19, no. 1 (March 2015), pp. 43-69.

৬৮. Ibid.

৬৯. https://www.prothomalo.com/opinion/editorial/70ycnmt1a3

৭০. https://www.tbsnews.net/bangladesh/education/bangladeshs-slow-march-towards-100-literacy-492058

৭১. Jouhki, J., 2013, A PHONE OF ONE'S OWN? *Suomen Antropologi: Journal of the Finnish Anthropological Society, 38*(1). Tacchi, J., Kitner, K. R., & Crawford, K. (2012). Meaningful mobility: Gender, development and mobile phones. Feminist Media Studies, 12(4), 528-537. Tenhunen, S., 2008, Mobile technology in the village: ICTs, culture, and social logistics in India. *Journal of the Royal Anthropological Institute, 14*(3), 515-534.
Tenhunen, S., 2018, *A village goes mobile: telephony, mediation, and social change in rural India*: New York, NY: Oxford University Press.

৭২. https://bbs.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bbs.portal.gov.bd/page/b343a8b4_956b_45ca_872f_4cf9b2f1a6e0/2023-01-08-07-00-667cde6536494c707e86d483c0b618a5.pdf

৭৩. O'Donnell, A., & Sweetman, C. (2018). Introduction: gender, development and ICTs: Taylor & Francis.

৭৪. https://web.archive.org/web/20160103124803/https://www.isoc.org/inet97/proceedings/E3/E3_1.HTM#:~:text=Online%20Internet%20was%20legalized%20in,15%20July%201996%20(2).

৭৫. Intel Corporation, Women and the Web (2012). Available from http://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/pdf/women-and-the-web.pdf.

৭৬. Bangladesh population, 2023, live — Countrymeters

৭৭. https://bbs.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bbs.portal.gov.bd/page/b343a8b4_956b_45ca_872f_4cf9b2f1a6e0/2023-01-08-07-00-667cde6536494c707e86d483c0b618a5.pdf

৭৮. Rupak Bhatta, "The Shahbag Generation of Bangladesh", The Assam Chronicle, 24 September 2014. Available from http://assamchronicle.com/news/shahbag-generation-bangladesh

৭৯. https://www.takebackthetech.net/region/asia

৮০. মোঃ খলিলুর রহমান, ২০০৬, নদী বাঁচাও-দেশ বাঁচবে, ধানসিঁড়ি প্রকাশনা, ঢাকা

৮১. পূর্বোক্ত, পৃ ১৩৭-১৪১

৮২. পূর্বোক্ত, পৃ ১৬৭-১৭৩

৮৩. https://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/s12302-020-00447-x

৮৪. https://www.unep.org/news-and-stories/press-release/textile-producing-nations-unite-reduce-chemical-waste

৮৫. https://www.unep.org/news-and-stories/press-release/textile-producing-nations-unite-reduce-chemical-waste

৮৬. আল ফাতাহ মাহমুদ, ৩৭ হাজার দখলদারের তথ্য মুছে দিয়েছে নদী রক্ষা কমিশন, দৈনিক বণিকবার্তা, ১৮.০১.২০২৩

৮৭. সাধন সরকার, হারিয়ে যেতে বসেছে দেশি প্রজাতির মাছ, দৈনিক ইত্তেফাক, ২৮.১০.২০২০

৮৮. প্রদীপ সরকার, ছড়িয়ে পড়া সাকার মাছ এখন বড় দুশ্চিন্তার কারণ, দৈনিক প্রথম আলো, ০৬.০৯.২০২২

প্রদীপ সরকার, সেই সাকার মাছ হলো নিষিদ্ধ, দৈনিক প্রথম আলো, ১৪.১১.২০২২

মোঃ মাসুদ রানা, ২০২৩, জলাশয়ের শত্রুখ্যাত সাকার মাছ নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবহারের কলাকৌশল, কৃষিকথা, ঢাকা, চৈত্র ১৪২৯

সানাজানা চৌধুরী, পিরানহা ও আফ্রিকান মাগুর: নিষিদ্ধ এই 'রাক্ষুসে' মাছগুলো কীভাবে আসছে বাংলাদেশে?, বিবিসি বাংলা, ১১.০৯.২০২০

৮৯. দেবল দেব, বিচ্যুত স্বদেশভূমি: বাংলার জৈব সংস্কৃতির লুপ্তাবশেষের সন্ধান, ধ্যানবিন্দু ও বসুধা, কলকাতা, ২০২১, পৃ ১৪৬

৯০. ভূগর্ভস্থ পানি নির্ভরতায় মহাসংকটের আশঙ্কা!, দি ডেইলি স্টার বাংলা, ২৮.০৩.২০২৩

৯১. মাহতাব উদ্দীন আহমেদ ও পারভেজ আহমদ রনি, ২০২২, *পানির দেশে পানি কোথায় গেল? কীভাবে গেল?*, সর্বজনকথা, ৮ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা

আনোয়ার আলী, ২০২৩, নলকূপ অপারেটরদের হাতে জিম্মি বরেন্দ্র অঞ্চলের কৃষক, দি ডেইলি স্টার বাংলা, ২৬.০৯.২০২৩

আনোয়ার আলী, ২০২৩, বরেন্দ্র অঞ্চলের ৪০ ভাগ এলাকা 'পানি সংকটাপন্ন: গবেষণা', দি ডেইলি স্টার বাংলা, ৩১.০৭.২০২৩

৯২. বুলবুল আহমেদ, ২০২৩, চলনবিল গিলে খাচ্ছে 'উন্নয়ন', দি ডেইলি স্টার বাংলা, ০৪.১১.২০২৩

৯৩. 'যারা যমুনা নদী সংকুচিত করতে চায় তাদের বিচারের মুখোমুখি করতে হবে', দি ডেইলি স্টার বাংলা, ১১.০৩.২০২৩

৯৪. সৈয়দ আশফাকুল হক, ২০২৩, নিঃশেষের পথে ঢাকার ভূগর্ভস্থ পানি, দি ডেইলি স্টার বাংলা, ০৭.১২.২০২৩

৯৫. খ্রিষ্টপূর্ব ৮ম-৬ষ্ঠ শতাব্দীতে রচিত, তবে এর কিছু অংশ প্রাচীনকাল কাল থেকে মুখে মুখে প্রচলিত ছিল।

৯৬. Subhash Palekar, 2016, The Philosophy of Spiritual Farming (Revised sixth Renewal Edition): Part One, Zero Budget Natural Farming Research, Development and Extension Movement, Amravati, p 90

৯৭. পূর্বোক্ত, ঢ় ৭৩

৯৮. দেবল দেব, ২০২১, বিচ্যুত স্বদেশভূমি: বাংলার জৈব সংস্কৃতির লুপ্তাবশেষের সন্ধান, ধ্যানবিন্দু ও বসুধা, কলকাতা, পৃ ১৩০-১৪০

৯৯. পূর্বোক্ত,, পৃ ১০৫-১০৬

১০০. পূর্বোক্ত,, পৃ ১০৩-১০৪

১০১. ইনাম আল হক, পাখিদেরও আছে নাকি মন, বাংলাদেশ বার্ড ক্লাব, ঢাকা, ২০১৩, পৃ ১০১-১০৯

১০২. পূর্বোক্ত,, পৃ ১০৩, ১৩২, ১৪১, ১৪৩

১০৩. পূর্বোক্ত,, পৃ ১৩-১৫

১০৪. পূর্বোক্ত,, পৃ ৯৪, ১১৫

১০৫. ফরিদা আখতার, বৈশ্বিক উষ্ণতা নিরসনে বিশ্বনেতাদের তৎপরতা যথেষ্ট নয়, দৈনিক বণিকবার্তা, ০৫.১২.২০২৩

১০৬. https://www.prothomalo.com/world/7yowi673cc

১০৭. https://www.fao.org/sustainability/news/detail/en/c/1274219/

১০৮. পাভেল পার্থ, দুবাই জলবায়ু সম্মেলন ও বিমর্ষ পৃথিবী, ডয়চে ভেলে, ২৭.১২.২০২৩

১০৯. যুবায়ের আহমেদ, দুবাইয়ে জলবায়ু সম্মেলনে 'ঐতিহাসিক' চুক্তি?, ডয়চে ভেলে, ১২.১২.২০২৩

১১০. https://www.unicef.org/stories/young-climate-activists-demand-action-inspire-hope

(এখানে রিইব এর প্রকাশিত বই এর তালিকা যাবে, 'জীববৈচিত্র্য কৃষির জিজ্ঞাসা' বই থেকে)